সহজে বিজ্ঞান

অমরেন্দ্রকুমার সেন

বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো. কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৭০

প্রকাশক—স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর—কালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬, চালতা বাগান লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট ও ছবি—সুধাময় দাশগুপ্ত

পরম কল্যাণীয়া

স্বাতী ও

শাশ্বতীকে

পিসেমশাই

এখন যে যুগ চলেছে তাকে বলা হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের বলে কত অসম্ভব কাণ্ডকারখানা ঘটছে, কত দুরারোগ্য রোগ সারছে, চাষবাসের কত উন্নতি হচ্ছে, আরও কত কি ঘটছে।

এই যে আকাশ দিয়ে সাঁ করে বিমানখানা দক্ষিণ দিকে উড়ে চলে গেল তার দিকে আমরা অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলি সায়েন্স কি আশ্চর্য ব্যাপারই না ঘটিয়েছে।

বিমান তৈরি করবার আগে মানুষকে অনেক খাটতে হয়েছে অনেক দিন ধরে। আগে তাকে জানতে হয়েছে বিজ্ঞানের গোড়ার কথা, জানতে হয়েছে কি করলে একটা যন্ত্রকে আকাশে ওড়ানো যায়। সেই যে গোড়ার কথা, সেটাই হল আসল বিজ্ঞান। সেই আসল বিজ্ঞান শিখলে ও জানলে তবেই ইঞ্জিনিয়াররা বিমান তৈরি করতে পারে।

মোটরগাড়ি তৈরি হয় কারখানায়, মোটরগাড়ির সঙ্গে কারখানার সম্পর্ক আছে ; দুটোর নাম আলাদা, কাজও আলাদা, দু'জনকে এক নামে ডাকিও না, মোটরগাড়িকে কারখানা বলি না কেন না আমরা জানি কারখানার কাজ মোটরগাড়ি তৈরি করা।

কারখানা যেন বিজ্ঞান, তার কাজ মোটরগাড়ি তৈরি করা। মোটরগাড়ি হল বিজ্ঞান শিক্ষার ফলে উৎপন্ন একটি যন্ত্র বিশেষ।

প্রকৃতিতে নানা রকম ক্রিয়াকলাপ ঘটছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। নদীতে বান আসছে, ছাগলের ছানা হচ্ছে, মাঠে ধান হচ্ছে। এই সব ব্যাপার কি করে ঘটছে, একদল লোক সেগুলি শিখেছে এবং সেই শিক্ষার ফলেই আকাশের বিদ্যুৎকে ধরে ঘরে ঘরে আলো জ্বালানো যাচ্ছে। মূল তথ্যটা আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানীরা আর অন্য লোকেরা সেই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে কত কি তৈরি করছে।

বিজ্ঞান কি জানতে হলে গোড়ার কথাও কিছু জানতে হয়। এই বইখানিতে খুব সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের গোড়ার কথা কিছু কিছু বলা হয়েছে। সেগুলি জানলে বিজ্ঞান বিষয়ে আরও জানবার আগ্রহ বাড়বে।

সূচী

এই লেখকের লেখা—

ডাক টিকিট

নীরোগ শরীর

ভোজ্য ও ভোজন

অলিম্পিকের প্রাঙ্গণে

সহজে বিজ্ঞান

পৃথিবী আমাদের বাড়ি

ছোটবেলায় শিশুদের যখন গুণতে শেখানো হয় তখন তাদের দিয়ে বলানো হয় একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, এই রকম করে নয়ে নবগ্রহও শেখানো হয়। একে চন্দ্র মানে যেমন একটি চাঁদ তেমনি নয়ে নবগ্রহ মানে ন'টি গ্রহ। আজকাল জানা গেছে, নয়টি নয়, সূর্যকে মাঝখানে রেখে আকাশে দশটি গ্রহ ঘুরছে। এই দশটি গ্রহের নাম হল বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। এই সব গ্রহের মধ্যে কারও কারও উপগ্রহ আছে, পৃথিবীর উপগ্রহ যেমন চাঁদ। সূর্য আর এই দশটি গ্রহ নিয়ে এই যে জগৎ, এর নাম সৌরজগৎ।

অন্ধকার রাত্রে, পরিষ্কার মেঘহীন আকাশে যখন হাজার হাজার তারা ঝিকমিক করে, তখন ভাল করে চাইলে দেখা যাবে, যে দু' একটি তারা ঝিকমিক করছে না। আসলে সেগুলি তারা নয়, সেগুলির নিজের কোনো আলো নেই, তাদের আলো সূর্যের কাছ থেকে ধার করা, তাই তারা ঝিকমিক করে না। নক্ষত্রদের সূর্যের মতো নিজের আলো আছে, তারা ঝিকমিক করে। আমাদের সূর্যও একটি নক্ষত্র, আমাদের কাছে আছে বলে অত বড় দেখায়। কাছে হলেও সূর্য পৃথিবী থেকে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে আছে।

আমাদের এই পৃথিবী আর বাকি নয়টি গ্রহ এক সময়ে

সূর্যের অংশ ছিল। সূর্য তখন আরও বড় আর আরও গরম ছিল। যে ভাবেই হোক সূর্য থেকে টুক্‌রো টুক্‌রো অংশ ছিটকে বেরিয়ে পড়ে। ছিটকে বেরিয়ে পড়লেও তারা সূর্য থেকে দূরে চলে যেতে পারল না। এক একটা অদৃশ্য দড়ি যেন এদের প্রত্যেককে বেঁধে রাখল, আজও বেঁধে রেখেছে। সেই সব টুক্‌রোগুলি সূর্যের চারদিকে ঘুরতে লাগল, ঘুরতে ঘুরতে সেগুলিও গোল হয়ে গেল।

ঐ যে অদৃশ্য দড়ি, সে আসলে দড়ি নয়, একটা অদৃশ্য শক্তি, পণ্ডিতেরা যার নাম দিয়েছেন মহাকর্ষ. সে সব কিছুকে টেনে রেখেছে। সূর্য এই মহাকর্ষের জোরে পৃথিবী আর অপর অপর গ্রহগুলিকে টেনে রেখেছে, তেমনি পৃথিবীর নিজের মহাকর্ষ টেনে রেখেছে চাঁদকে। পৃথিবী আমাদের আর তার ওপর যা কিছু আছে সব কিছুকে টেনে আটকে রেখেছে, নইলে হয়ত অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটতে পারত। তুমি যে রসগোল্লাটি খেতে যাচ্ছ সেটি হয়ত হঠাৎ উড়ে গিয়ে তোমার ছোট বোনের থালায় চলে গেল কিংবা তুমি হয়ত হাই জাম্প করতে লাফিয়ে উঠে অন্য এক দেশে চলে গেলে। কী যে হত কেউ বলতে পারে না। গাছপালা, নদনদী, সমুদ্র কিছুই হয়ত থাকত না।

একদিন আমাদের পৃথিবী সূর্যের গা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল, সে কয়েক শত কোটি বছর আগে। সেদিনকার সেই পৃথিবীর চেহারা মোটেই আজকের পৃথিবীর মতো ছিল না। তখন সে কঠিন হয়নি, ঠাণ্ডাও হয়নি। নিজে ত' ভীষণ গরম ছিলই, তার চার দিকে আবার ঘিরে ছিল প্রচণ্ড ভীষণ গরম গ্যাস। পৃথিবী সূর্যের চেয়ে অনেক

ছোট, আস্তে আস্তে সে একদিন ঠাণ্ডা হল, চাঁদ আরও ছোট, সে পুরোপুরি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, এমন কি চাঁদের আলোকেও আমরা ঠাণ্ডা আলো বলে থাকি। সূর্য পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়, তার ঠাণ্ডা হতে এখনও কত কোটি বছর লাগবে কে জানে। একদিন না একদিন সে ঠাণ্ডা হবেই।

পৃথিবীর ভেতরটা কিন্তু এখনও গরম আছে। গভীর কয়লার খনির নীচে নামলে এই গরম বেশ টের পাওয়া যায়। আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে গরম গরম গলিত ধাতু বেরিয়ে আসে। অনেক জায়গায় গরম জলের ফোয়ারাও আছে। এই সব থেকে বোঝা যায় যে পৃথিবীর ভেতরটা এখনও ঠাণ্ডা হয়নি।

পৃথিবী যখন ঠাণ্ডা হল তখন এক কাণ্ড ঘটল। পৃথিবীর আকাশে যে মেঘ জমা হয়েছিল তা গলে গিয়ে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। পৃথিবীতে এই প্রথম বৃষ্টিপাত। পৃথিবী গরম থাকায় এতদিন বৃষ্টিপাত হতে পারেনি। তা সেই যে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল তার আর থামবার নাম নেই। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে সেই বৃষ্টি পড়তে লাগল। এত বৃষ্টি পড়ল যে পৃথিবীর সমস্ত ছোট বড় গর্ত জলে ভরে গেল; মহাসাগর, সাগর, হ্রদ তৈরি হল।

সূয্যি মামা

সূর্য নাকি আমাদের মামা। মামা কেন? মামার চেয়েও বেশি। সূর্য না থাকলে আমাদের আসল যারা মামা, তারা, এমন কি আমরাও বেঁচে থাকতে পারতুম না। যদিও গরম কালে সূর্যের প্রখর তাপে আমাদের খুব কষ্ট হয় তাহলেও সূর্যের উপকার লিখে শেষ করা যায় না। প্রাচীন কাল থেকে সকল লোক সূর্যের বন্দনা গেয়ে আসছে। সূর্য সকল জীবের জীবন।

মনে হয় চাঁদ আর সূর্য বুঝি আকারে প্রায় এক। এখান থেকে দেখে তাই মনে হয়। কিন্তু আকাশে যখন উড়োজাহাজ ওড়ে কিংবা ঘুড়িখানা যখন অনেক উঁচুতে বেড়ে যায় তখন তাদেরও ত ছোট মনে হয়। কোনো জিনিস দূরে থাকলে ছোট দেখায়।

চাঁদের চেয়ে সূর্য অনেক দূরে আছে, তাই তাকে ছোট দেখায়। চাঁদ পৃথিবী থেকে দু' লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল দূরে, আর সূর্য নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে।

পৃথিবীর ব্যাস হল মোটামুটি আট হাজার মাইল। পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে যদি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় একটা সুড়ঙ্গ খোঁড়া যায়, তাহলে সেটা হবে আট হাজার মাইল লম্বা। আর সূর্যের ব্যাস এর একশ' আট গুণ বেশি।

আকারেও কি সূর্য কম বড়? সূর্য যদি ফাঁপা হত তাহলে তার মধ্যে একটি দুটি করে এক লক্ষ তিরিশ হাজারটি পৃথিবী ঢুকে যেত। আর ওজন? পৃথিবীর ওজন যদি ধরা হয় এক মণ তাহলে সূর্যের ওজন তিন লক্ষ তিরিশ হাজার মণ।

পৃথিবীর যেখানে পাক খেতে একবার লাগে চব্বিশ ঘণ্টা, সূর্যের লাগে সেখানে ছাব্বিশ দিন।

আমাদের পৃথিবীতে যেমন মাটি, পাথর, বালি কিংবা গাছপালা আছে, সূর্যে সেরকম কিছু নেই। সূর্য জ্বলন্ত ঘন গ্যাসের বিরাট, বিপুল, বিশাল এক পিণ্ড। পৃথিবীর যেমন বায়ুমণ্ডল সূর্যের তেমনি আছে বাষ্পমণ্ডল। সেই বাষ্পমণ্ডল লক্ষ লক্ষ মাইল গভীর আর তা সব সময়ে জ্বলছে। আমরা আলো আর তাপ ঐ জ্বলন্ত বাষ্পমণ্ডল থেকে পাচ্ছি। এই বাষ্পমণ্ডলে সব সময়েই প্রচণ্ড ঝড় বইছে, মাঝে মাঝে ঝড়ের দাপটে বাষ্পমণ্ডলের কয়েক লক্ষ মাইল ফাঁকা হয়ে যায়। সেই সময়ে সূর্যের গায়ে কালো কালো দাগ দেখা যায়। এদের বলা হয় সৌরকলঙ্ক। ইংরেজিতে সানস্পটস্। এগুলি বেশি বড় হলে, মানে সূর্যে ঝড় বেশি দিন ধরে চললে আর সৌরকলঙ্কগুলি বেশি বড় হলে রেডিও শোনবার অসুবিধে হয়।

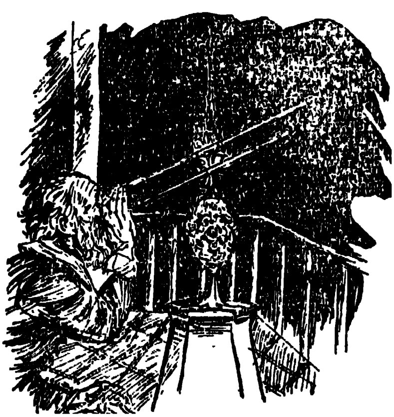
সূর্য কত গরম? একটা হিসেব নেওয়া যাক। দু' হাত লম্বা আর দু' হাত চওড়া আর কতটুকু জায়গা? সূর্যের এইটুকু জায়গা থেকেই যে তাপ আসে, পৃথিবীতে একসঙ্গে দু'শো মণ কয়লা পুড়িয়ে সেটুকু তাপও পাওয়া যায় না।

সূর্য থেকে আমরা তার কতটুকুই বা তাপ পাই। সূর্য যদি তার সকল গ্রহ উপগ্রহের জন্যে দু'শ কুড়ি কোটি টাকা বিলোয় তাহলে পৃথিবীর ভাগ্যে পড়বে মাত্র এক টাকা। এই এক টাকার জোরেই অস্থির। সেই সমস্ত তাপ যদি এক জায়গায় পড়ত তাহলে তা দিয়ে মাত্র এক মিনিটে দশ লক্ষ মণ জলকে টগবগ করে ফুটিয়ে নেওয়া যেত।

আর আলো? পূর্ণিমার রাত্রে চেষ্টা করলে জ্যোৎস্নার আলোতে বই পড়া যায়। সেই জ্যোৎস্নার আলোকে যদি দিনের আলোর সমান করে তুলতে হয় তাহলে পাঁচটি, দশটি নয়, ছ'লক্ষ চাঁদ দিয়ে আকাশটিকে ভর্তি করে দিতে হবে।

গ্যালিলিও

যদি বলি যে পৃথিবী এক জায়গায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে আর সূর্য তার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহলে সকলে নিশ্চয়ই আমাকে বোকা ভাববে। কিন্তু তিনশ' বছর আগে ইয়োরোপের লোকেরা তাই বিশ্বাস করত। গ্যালিলিও যখন তাঁর তৈরি দূরবীন দিয়ে গ্রহ নক্ষত্র সব দেখে প্রমাণ করলেন যে সূর্য এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আর পৃথিবী তার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন তাঁকে জেল খাটতে হয়েছিল।



গ্যালিলিও

এই কথা তাঁর আগে পোলাণ্ডের বিজ্ঞানী কোপার্নিকাসও বলেছিলেন কিন্তু তাঁকে জেল খাটতে হয়নি। তারও অনেক অনেক দিন আগে থাকতে ভারতবাসীরা জেনে আসছে যে সূর্য এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, পৃথিবী তার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গ্যালিলিওর সমকক্ষ প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী পৃথিবীতে আর মাত্র দু'জন জন্মেছেন, একজন হলেন ইংলণ্ডের আইজ্যাক নিউটন আর অপরজন হলেন জার্মানির আইনস্টাইন। বিজ্ঞান চর্চা ছাড়া গ্যালিলিও চমৎকার ছবি আঁকতে পারতেন, সুন্দর বাঁশি বাজাতে পারতেন আবার ভাল কারিগর ছিলেন। নিজের হাতে তিনি অনেক ভাল দূরবীন তৈরি করেছেন।

গ্যালিলিওর বাবা বেশ একজন লেখাপড়া জানা লোক ছিলেন কিন্তু গরীব। গ্যালিলিওর জন্ম ইটালির পিসা নগরীতে, ১৫৬৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি। বিলেতের সবচেয়ে বড় নাট্যকার মহাকবি সেক্সপিয়রও এই বছরেই জন্মেছিলেন।

গ্যালিলিও বড় হয়ে ডাক্তারি পড়তে লাগলেন, কিন্তু ডাক্তারি পড়তে তাঁর ভাল লাগল না। অঙ্ক আর পদার্থবিদ্যার দিকে তিনি বেশি ঝুঁকে পড়লেন।

তখনকার ইউরোপের লোকের ধারণা ছিল যে প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল সব কিছুরই সমাধান করে গেছেন, আর নতুন কিছু জানবার, ভাববার বা করবার নেই।

গ্যালিলিওর বয়স তখন সতেরো। তিনি একদিন গির্জায় হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছেন, মাথার ওপর একটা ঝাড়লণ্ঠন দুলছে। একটু আগেই একজন ভৃত্য লণ্ঠনে তেল দিয়ে গেছে, তারই হাতের নাড়া লেগে আলোটা তখনও দুলছে আর ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে শব্দ হচ্ছে। শব্দে বিরক্ত হয়ে গ্যালিলিও আলোর দিকে মুখ তুলে চাইলেন। সেদিকে একটুক্ষণ চাইতেই তাঁর মনে হল যে আলোটা এদিক থেকে দুলে ওদিকে যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে, এই যাওয়া-আসার সময়টা যেন একই লাগছে। তখনও ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়নি। গ্যালিলিও হঠাৎ তাঁর হাতের

নাড়ি টিপে সময়টা দেখলেন, হ্যাঁ, তিনি যা ভেবেছিলেন তাই ঠিক।

প্রার্থনা পড়ে রইল। তিনি ছুটলেন বাড়িতে। সুতোয় সীসের গোলক বেঁধে তাকে দুলিয়ে তিনি দেখলেন যে সীসের দোলক দুলতে দুলতে একবার যেয়ে ফিরে আসতে একই সময় লাগে। গোলক ভারি বা হালকা হলেও একই সময় লাগে, কেবল সুতো ছোট বড় হলে সময় কম-বেশি লাগবে। তিনি একটা ছোট যন্ত্র তৈরি করলেন যার সাহায্য তখনকার ডাক্তারদের পক্ষে নাড়ির ধুকধুক্ গোনার সুবিধে হল। আরও পরে সেই দোলকের ওপর ভিত্তি করে ঘড়ি তৈরি হল।

ভাল অঙ্ক-জানা লোক বলে গ্যালিলিওর নাম ছড়িয়ে পড়ল। পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্যালিলিও অঙ্কের অধ্যাপক হলেন। লোক পাওয়া যাচ্ছিল না, মাইনে খুব কম, মাসে ষোলো টাকার মত।

অ্যারিস্টটল বলেছিলেন যে একটা ভারি জিনিস আর একটা হালকা জিনিস যদি একসঙ্গে উঁচু জায়গা থেকে ফেলা হয় তাহলে ভারি জিনিসটা আগে পড়বে। গ্যালিলিও বললেন তা কেন? দুটো জিনিস একসঙ্গেই পড়বে। ইটালির লোকেরা অবিশ্বাসের হাসি হাসল। গ্যালিলিও ছাড়বেন না, তিনি পরীক্ষা করে দেখাবেন। একদিন সাক্ষীসাবুদ নিয়ে তিনি পিসার হেলানো থামের ওপরে গিয়ে উঠলেন। থামটা বেশ উঁচু কিন্তু হেলে আছে। গ্যালিলিও সঙ্গে নিলেন তিনটে পাথর, একটার ওজন এক পাউণ্ড, আর একটার পাঁচ পাউণ্ড, বাকিটার ওজন দশ পাউণ্ড। হেলানো থামের মাথা থেকে তিনটে পাথর একই সঙ্গে ফেললেন এবং তিনটেই একসঙ্গে মাটিতে পড়ল।

মজা দেখবার জন্যে নীচে খুব ভিড় হয়েছিল। সকলে নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখল, মনে মনে বুঝলও হয়ত যে অ্যারিস্টটল ভুল লিখে গেছেন, কিন্তু মুখে বলল তা বলে এতদিনের ধারণা ত্যাগ করতে হবে? শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা বলতে হবে? না, গ্যালিলিওকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ষোলো টাকা মাইনের চাকরিটি গেল। তাঁর ভাগ্য ভাল। ইটালির আর বিশ্ববিদ্যালয়ে, পাদুয়াতে আরও ভাল চাকরি পেলেন। সেখানে গ্যালিলিও একটা দূরবীন তৈরি করলেন। সেই দূরবীন দিয়ে তিনি অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন বৃহস্পতির চারটি চাঁদ আছে, তিনি আবিষ্কার করলেন সূর্যের ওপর কলঙ্ক রেখা, চাঁদের পাহাড়। তিনি বললেন আকাশের ছায়াপথগুলি অসংখ্য তারার সমষ্টি। আরও কত কি না-জানা জিনিস খুঁজে বার করলেন। তিনি প্রমাণ করলেন যে কোপার্নিকাস যা বলে গেছেন তাই ঠিক, সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে।

গ্যালিলিও আবার তাঁর প্রিয় শহর পিসায় ফিরে এসেছেন, যেখানে ফেরবার জন্যে এতদিন তিনি ব্যাকুল ছিলেন। পিসায় ফিরে আসাই তাঁর কাল হল, তারওপর তিনি যা বলে বেড়াতে লাগলেন তাতে ত তাঁর সর্বনাশ হল।

বাইবেলের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্যে তাঁর বিচার হল। বিচারে তাঁর ওপর হুকুম হল যে তিনি এতদিন যা বলে এসেছেন সে সব তাঁকে ফিরিয়ে নিতে হবে, আর যেন এসব কথা তিনি উচ্চারণ না করেন তাহলে ভবিষ্যতে খুব খারাপ ফলভোগ করতে হবে। গ্যালিলিও বিচারকের আদেশে সই করে দিলেন।

গ্যালিলিও সই করলেন বটে কিন্তু কথা রাখতে পারলেন না। তিনি আবার একখানা বই লিখলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন, শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। বিচারের জন্যে বৃদ্ধ ও অসুস্থ গ্যালিলিওকে শেকল দিয়ে বেঁধে রোমে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁকে দিয়ে জোর করে লিখিয়ে নেওয়া হল যে এতদিন যা তিনি বলে এসেছেন সে সবই মিথ্যা। গল্পে আছে যে গ্যালিলিও কাগজে সই করে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি বলেছিলেন যে—পৃথিবী কিন্তু সত্যই ঘুরছে। তাঁকে জেলে পাঠানো হল।

জেলে বসে তিনি 'গতির সূত্র' নাম দিয়ে আর একখানি বই লিখেছিলেন। বইখানি লুকিয়ে হলাণ্ডে পাঠানো হয়, সেখানেই ছাপা হয়েছিল। ছাপা বই যখন গোপনে তাঁর হাতে এল তখন তিনি অন্ধ।

১৬৪২ সালের ৮-ই জানুয়ারি তিনি মারা যান। আর এই বছরেই জন্মগ্রহণ করেন ইংলণ্ডে আইজ্যাক নিউটন।

চাঁদের দেশে

চাঁদও আমাদের মামা। অতি শিশুকাল থেকে চাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। কিন্তু চাঁদের বিষয়ে আমরা যা কিছু শুনে এসেছি সব নেহাতই গল্পকথা।

চাঁদ নক্ষত্র নয়, গ্রহও নয়, পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবী তার উপগ্রহ চাঁদকে নিয়ে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

পূর্ণিমার রাত্রে অমন সুন্দর যে চাঁদের আলো সে আলো কিন্তু চাঁদের নিজের নয়, সূর্যের কাছ থেকে ধার করা। সূর্যের আলো চাঁদের ওপর পড়ে, তাতেই আমরা চাঁদকে দেখতে পাই।

পৃথিবী থেকেই চাঁদের জন্ম হয়েছে তাই সে পৃথিবীর চেয়ে ছোট ; পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ।

আজকাল চাঁদে যাবার চেষ্টা চলছে। চাঁদে যদি পৌঁছনো যায় তাহলে সেখানে শরীর বেশ হাল্কা মনে হবে, কারণ পৃথিবীর চেয়ে চাঁদের মহাকর্ষ শক্তি কম। সেখানে লাফাতেও পারা যাবে অনেক দূর, ছোটখাটো নালা সহজেই লাফিয়ে পার হওয়া যাবে।

চাঁদে জল নেই, বাতাস নেই, গাছপালাও নেই, মানুষ জীবজন্তু কিছুই নেই। বাতাস না থাকায় কোনো শব্দ শোনা যায় না, কোনো জিনিসের গন্ধও পাওয়া যায় না। চাঁদ একেবারেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পৃথিবী থেকে চাঁদের গায়ে যে সব কালো কালো দাগ দেখা যায়, যাদের বলা হয় চরকা-বুড়ি কিংবা চাঁদের কলঙ্ক আসলে সেগুলি চাঁদের পাহাড়। চাঁদে অনেক আগ্নেয়গিরিও আছে, এখন সেগুলি একেবারে নিভে গেছে।

চাঁদে যাবার সময় এখান থেকে যে সব জিনিসপত্তর নিয়ে যাওয়া যাবে সেগুলি সেখানে পৌঁছে অনেক হালকা হয়ে যাবে। সঙ্গে যদি সের বারো সন্দেশ নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে চাঁদে তার ওজন করে দু' সের দাঁড়াবে। তেমনি চাঁদে যদি সোনা পাওয়া যায়, তার খানিকটা পৃথিবীতে আনতে পারলে ওজন অনেক বেড়ে যাবে।

চাঁদে দিনের বেলায় যেমন ভীষণ গরম রাত্রে তেমনি প্রচণ্ড শীত, সেজন্যে অবশ্য তৈরি হয়েই যেতে হবে। তবে চাঁদের অপর পিঠ যেটা পৃথিবী থেকে কখনই দেখা যায় না, সে দিকটা একবার দেখে আসা যাবে।

যারা চাঁদে যাবার চেষ্টা করছেন, একজন পণ্ডিত তাঁদের সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে চাঁদ একেবারে মরে গিয়ে শুকনো খটখটে হয়ে গিয়েছে। ভারি ও বড় রকেট নিয়ে সেই চাঁদে নামলে চাঁদ ফেটে চৌচির হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে পারে। শেষ পর্যন্ত চাঁদের আর অস্তিত্বই থাকবে না হয়ত।

অমন সুন্দর জ্যোৎস্নার আলোও তখন আর থাকবে না, সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা খেলবে না, চন্দ্রগ্রহণও দেখা যাবে না।

তবে যারা এখানে খেলায় পারিতোষিক পায় না তারা চাঁদে গেলে অনায়াসে 'মুন রেকর্ড' করতে পারবে, হাই জাম্প করতে পারবে ৩৬ ফুট আর দৌড়তে পারবে ঘণ্টায় ৯৬ মাইল বেগে।

পৃথিবীর আকর্ষণ

পৃথিবী সকল জিনিসকে এমন কি সকল মানুষকে তার নিজের দিকে টেনে রাখছে ঠিক যেমন চুম্বক লোহাকে টানে। পৃথিবীর এই টান বা আকর্ষণকে বলা হয় মহাকর্ষ। মহাকর্ষ শক্তির আবিষ্কারক বলে নিউটনের নাম অমর হয়ে আছে। তিনি অঙ্ক কষে এই মহাকর্ষ শক্তিকে পাকাপাকিভাবে প্রমাণ করেছেন।

নিউটনের জন্মের অনেক আগে ভারতবর্ষের ভাস্করাচার্য তাঁর সংস্কৃতে লেখা সিদ্ধান্ত শিরোমণি বইয়ে এই মহাকর্ষ শক্তির কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, পৃথিবী সকল জিনিসকে টেনে ত রাখেই উপরন্তু পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য এরা

সবাই পরস্পরকে টেনে রাখছে, সেজন্যে সকলে নিজের নিজের রাস্তায় ঠিক মতো ঘুরছে। তবে ভাস্করাচার্য সোজাসুজি কোনো প্রমাণ দিয়ে যাননি।

প্রমাণ করলেন ইংলণ্ডের সার আইজ্যাক নিউটন অনেক দিন পরে।

নিউটন ১৬৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তখন প্রমাণ হয়েছে যে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে কিন্তু কেন যে ঘুরছে তা কেউ জানে না। অবশ্য অনেক কাল আগেই আর্যভট্ট এই কথা বলেছিলেন আর গ্যালিলিওকে ঐ কথা বলার জন্যে জেল খাটতে হয়েছিল। সে গল্প আর এক জায়গায় লেখা হল।

নিউটনের বয়স যখন অল্প তখন একদিন তিনি একটি আপেল গাছের তলায় বসে কি যেন ভাবছিলেন। তখন সন্ধ্যা বেলা, আকাশে চাঁদ উঠল। নিউটন ভাবতে লাগলেন এই যে চাঁদ উঠল, সে ত পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, কিন্তু কেন ঘুরছে? ঠিক এই সময়ে আপেল গাছ থেকে একটি পাকা আপেল খসে মাটিতে পড়ল। আপেলটি পড়ার শব্দ শুনে নিউটন যেন চমকে উঠলেন আর সেই সঙ্গে কঠিন প্রশ্নটির উত্তরও পাওয়া গেল। পৃথিবী টানছে বলে আপেলটি মাটিতে পড়ল। শুধু ঐ আপেল কেন পৃথিবী চাঁদকেও টেনে রেখেছে। নিউটন বললেন সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে, সেই আকর্ষণের জন্যে পৃথিবী আর অন্যান্য গ্রহেরা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। তিনি আরও বললেন যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেকটি পদার্থ অপর পদার্থকে টানছে।

আচ্ছা এইবার একবার মনে করা যাক যে পৃথিবী সকল

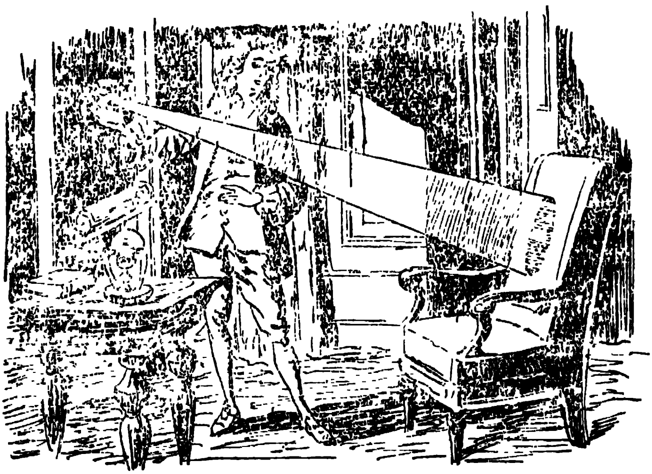
পদার্থকে যে নিজের দিকে টানছিল কাল সকাল থেকে তা আর টানবে না। তাহলে কি হবে? কল খুলে মুখ ধুতে গিয়ে দেখা যাবে যে জল পড়ছে না, কলে জল না পেয়ে কলসি থেকে জল ঢালতে গেলে, সেখানেও সেই একই অবস্থা, জল আর পড়ছে না। অবিশ্যি তখন যদি উঠে হেঁটে কল বা কলসি পর্যন্ত পৌঁছতে পারা যায়। আমার ত সন্দেহ হচ্ছে যে কেউ দাঁড়াতেই পারবে না, কোথায় সে ছিটকে চলে যাবে কে জানে। কোনো জিনিসেরই তখন যেন ওজন নেই, ছোট্ট একটি শিশু মস্ত একটা হাতির লেজ ধরে বোঁ বোঁ করে ঘোরাচ্ছে কিম্বা তাকে নিয়ে লোফালুফি খেলছে। আম পাড়বার জন্যে ঢিল ছুঁড়লে, সে ঢিল আর ফিরে এল না, আম বোঁটা থেকে খসলেও মাটিতে আর পড়ছে না।

নিউটন

ইংরেজি ১৬৪২ সাল, তিনশ' বছরেরও অনেক আগে। সেদিন বড়দিন। ইংলণ্ডের লিঙ্কনশায়ারে উলথ্রোপ গ্রামে এক কৃষকের ঘরে আইজ্যাক নিউটনের জন্ম হয়। যে দু'জন দাই তার প্রসবের সময় ঘরে ছিল তারা বলেছিল যে—এই পুঁয়ে পাওয়া ছেলেটা বাঁচলে বাঁচি। কিন্তু সেই ছেলে বেঁচেছিল ৮৫ বছর আর অমন ধারালো মাথাওয়ালা একটা ছেলে পৃথিবীতে আর জন্মেছে কিনা সন্দেহ। নিউটন জন্মাবার কয়েক সপ্তাহ আগেই তার বাবা মারা যান।

বারো বছর বয়সে নিউটনকে স্কুলে ভর্তি করা হয়। নিউটন ছোটবেলায় ছিল রোগা লিকলিকে। অন্য ছেলেরা তাকে

রাগাতো। নিউটন একদিন সত্যি সত্যিই রেগে গিয়ে তার চেয়ে বড় একটা ছেলেকে মাটিতে ফেলে বেদম মার দিল। সে দিন থেকে নিউটনের একটা জেদ চেপে গেল, এবার থেকে পড়াশোনায়ও সে সকলকে হারাবে।



কয়েক বছর স্কুলে পড়বার পর তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনে জমিজায়গা ক্ষেতখামার গরুবাছুর দেখতে দেওয়া হল। একাজে নিউটন মোটেই মন দিতে পারল না। তখনই সে সূর্যঘড়ি তৈরি করত, ছায়া দেখে বলে দিত কত বেলা হয়েছে; খেলনার হাওয়াকল তৈরি করত আবার রাত্রে ঘুড়ির লেজে খুদে লণ্ঠন ঝুলিয়ে গ্রামের লোকেদের ভয় দেখাতো। একটা জলঘড়িও তৈরি করল। তখনও ঘড়ির স্প্রিং তৈরি হয়নি। সে রোজ সকালে উঁচুতে রাখা একটা পাত্রে জল ঢেলে রাখত, সেই জল আস্তে আস্তে পড়ে জলঘড়ির কাঁটা চালাতো।

পড়াশোনার দিকে নিউটনের ঝোঁক বেশি দেখে তার এক মামা তাকে ফের পড়তে পাঠালেন। নিউটন যখন

কেমব্রিজে পড়তেন তখন অঙ্কের অধ্যাপক আইজ্যাক ব্যারো সেই অল্প বয়সেই, (নিউটনের বয়স তখন ১৯) নিউটনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে আশ্চর্য হন। অধ্যাপক ব্যারো যখন অবসর নিলেন তখন তিনি তাঁর নিজের পদটিতে কলেজের কর্তাদের বলে নিউটনকেই বসালেন। নিউটনের বয়স তখন ছাব্বিশ।

অধ্যাপকের এই চাকরিটি পাবার তিন বছর আগে লণ্ডনে ভীষণ প্লেগ দেখা দেয়, হাজার হাজার লোক সেই রোগে মারা যায়। স্কুল কলেজ সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও ছুটি দেওয়া হয়। নিউটন গ্রামের বাড়িতে এলেন, তখন তাঁর বয়স তেইশ। গ্রামের বাড়িতে তিনি ছিলেন আঠারো মাস। শোনা যায় যে নিউটন তাঁর সমস্ত বড় বড় আবিষ্কার এই আঠারো মাসের মধ্যেই করেছিলেন যদিও সেগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করেছিলেন।

কোপার্নিকাস বলেছিলেন যে সূর্য স্থির দাঁড়িয়ে আছে আর পৃথিবী তার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্যালিলিও তাঁর নিজের তৈরি দূরবীনে তার প্রমাণ দিলেন, কিন্তু কেন ঐ ভাবে ঘুরছে সে কথা তখন কেউ বলতে পারেনি।

এই ছুটির সময়েই সেই আপেল গাছ থেকে একটি আপেল একদিন নিউটনের সামনে পড়ল। এমন কত আপেলই ত কত লোকের সামনে মাটিতে পড়েছে, কত ছেলের সামনে কত কেটলিতে কত জল ফুটেছে কিন্তু সকলেই ত আর নিউটন বা জেমস ওয়াট নয়। নিউটনের মনে নানারকম প্রশ্ন জাগল, কেন আপেলটি মাটিতে পড়ল? অন্যদিকে গেল না কেন? ভাবতে ভাবতে নিউটন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে পৃথিবী সব কিছুকে নিজের দিকে টানছে এমন কি চাঁদকেও, পৃথিবীকে আবার

টেনে রেখেছে সূর্য, পৃথিবীর সঙ্গে অন্য গ্রহদেরও সূর্য টেনে রেখেছে।

এই সময়েই নিউটন আবিষ্কার করেন যে সূর্য রশ্মি যাকে আমরা সাদা দেখি, আসলে সাদা নয়। তার মধ্যে রামধনুর সাতটি রং মিশে আছে। তারপর তিনি আবিষ্কার করেন বাইনোমিয়াল থিওরেম আর ক্যালকুলাস নামে অঙ্ক এবং আরও অনেক কিছু।

তিরিশ বছর বয়সে তিনি বিলাতের রয়েল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন আর আরও ৩০ বছর পরে রয়েল সোসাইটির সভাপতি মনোনীত হন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি রয়েল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী যাঁকে 'সার' উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

নিউটনের সময় ইংলণ্ডে এডমাণ্ড হ্যালী নামে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন, তিনি আকাশের গ্রহ নক্ষত্র লক্ষ্য করতেন। ১৬৮২ সালে আকাশে একটা ধূমকেতু দেখেন। হ্যালী সাহেব সেই ধূমকেতুর রাস্তা ঠিক করেন কিন্তু হিসেবটা পাকা করবার জন্যে তিনি নিউটনের কাছে গেলেন। নিউটন বললেন যে সে হিসেব তিনি আগেই করে রেখেছেন, কিন্তু অনেক কাগজ পত্রের গাদা থেকে সেই হিসেবটা খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথায় রেখেছেন নিউটন আর মনে করতে পারলেন না।

এদিকে হ্যালী নিউটনের সব কাগজপত্র দেখে ত অবাক। তিনি ভাবতে লাগলেন কি অমূল্য সব বৈজ্ঞানিক তথ্য এই সব কাগজের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। হ্যালী সেই সব অপ্রকাশিত লেখা বই করে ছাপাতে চাইলেন। নিউটন রাজি হলেন। ল্যাটিন ভাষায় লেখা তাঁর শ্রেষ্ঠ বই "প্রিন্সিপিয়া" প্রকাশ

করলেন রয়েল সোসাইটি কিন্তু বই ছাপাবার সমস্ত খরচ দিয়েছিলেন হ্যালী নিজে।

নিউটন মারা যান ৮৫ বৎসর বয়সে ১৭২৭ সালের ২০শে মার্চ। নিউটনের মতো প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী ইংলণ্ডে আজও জন্মায়নি। তিনি যা আবিষ্কার করে গেছেন আজও সেগুলি বদলায়নি।

নিউটন সম্বন্ধে বেশ মজার মজার গল্প শোনা যায়।

একবার নিউটন গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা অঙ্ক কষছেন। কখন তার খাবার দিয়ে গেছে তিনি টের পাননি, এক মনে অঙ্ক কষে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তাঁর এক বন্ধু এসে তাঁর খাবার খেয়ে নিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে নিউটন মাথা তুলে দেখেন যে তাঁর বন্ধু বসে রয়েছেন আর খালি ডিস্ পড়ে রয়েছে। তিনি তখন বন্ধুকে বললেন, "দেখেছ হে, আমার কখন খাওয়া হয়ে গেছে আর আমি ভাবছি এখনও আমার খাওয়া হয়নি"।

নিউটনের কুকুরের খুব শখ ছিল। একবার এক কুকুরের বাচ্চা হলে তিনি ছুতোর মিস্ত্রিকে ডেকে একটা কাঠের ঘর তৈরি করতে বললেন, আর বললেন, একটা বড় দরজা আর একটা ছোট দরজা কাটতে, বড় দরজা দিয়ে মা যাবে আসবে আর ছোট দরজা দিয়ে বাচ্চারা। মিস্ত্রি যখন বললে যে একটা বড় দরজা দিয়েই ত মা আর বাচ্চারা যাওয়া আসা করতে পারবে। ব্যাপারটা নিউটন কিছুতেই বুঝতে পারলেন না। ছুতোর মিস্ত্রি যখন অন্য একটা ঘরে কুকুর আর বাচ্চাদের ঢুকিয়ে দিলে আর দরজা দিয়ে প্রথমে মা আর তার পিছনে পিছনে তার বাচ্চারা বেরিয়ে এল তখন হেসে উঠে নিউটন বললেন—"ওঃ বুঝেছি, একটার পর আর একটা আসবে! তাই বলো"।

পাথরের বই

আমাদের এই পৃথিবীকে আজ আমরা ঠিক যেমনটি দেখছি ঠিক সেইভাবেই তার সৃষ্টি হয়নি। কী ভাবে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে সে কথা আগেই বলেছি। পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে পর্যন্ত অনেক কোটি বৎসর অবধি এতই গরম ছিল যে কোনো জীবজন্তুর পক্ষে সেই পৃথিবীতে বাস করা সম্ভব ছিল না। তখন গাছপালাও দেখা দেয়নি। ক্রমশঃ পৃথিবী ঠাণ্ডা হল; ধীরে ধীরে অনেক দিন ধরে পৃথিবীতে সাগর মহাসাগর সৃষ্টি হল আর তার পরেই সৃষ্টি হল জীব আর গাছপালা। শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষ এল আর মানুষ তার বুদ্ধির জোরে কত কি সৃষ্টি করল, কত কি তৈরি করল।

সেই বহু কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীর চেহারা কেমন ছিল, আর একেবারে সব প্রথমে কী কী জীবজন্তু, কী কী গাছপালা দেখা দিয়েছিল সে সব জানা গিয়েছে।

ইতিহাস পড়ে প্রাচীনকালের রাজাদের কথা জানতে পারা যায়। একদল লোক যাদের বলা হয় ঐতিহাসিক, তাঁরা এই সব ইতিহাসের বই লিখে রেখে গেছেন, সেই সব বই পড়ে অনেক রাজা-রাণী, বাদশা বেগমের কথা জানা যায়।

মানুষই যখন পৃথিবীতে আসেনি, তখন কে আর ইতিহাস লিখবে? কিন্তু প্রকৃতি দেবী পাথরের বইয়ে ইতিহাস লিখে রেখেছেন নিজের ভাষায়, সে ভাষা শিখে মানুষকে সব কিছু জেনে নিতে হয়েছে। সে বই পাথরে লেখা, তার পাতা পাথরের তৈরি। সে বই কেমন, আর মানুষ কী করে পড়ল, সে কথা বলছি।

এক রকমের পাথর আছে যাদের নাম স্তরিত শিলা। নদী যেখানে সমুদ্রে পড়ে, সেখানে স্তরের পর স্তর পলি মাটি জমতে থাকে। ওপরের স্তরের চাপে নীচের স্তরগুলি একদিন পাথর হয়ে যায়। এই পাথরকে স্তরিত শিলা বলে। স্তর জমবার সময় একটা ব্যাপার ঘটে। নদীর স্রোতে নানা জিনিস, যেমন গাছ, তার ডাল, পাতা, ফল, ফুল কিংবা মরা জীবজন্তু, পোকা, মাকড়, মাছ, কত কি ভেসে আসে। এদের কিছু কিছু ঐ পলিস্তরে জমা পড়ে। জমা পড়ার ফলে তাদের মধ্যে কিছু কিছু নিজেরা পাথর হয়ে গেছে অথবা পাথরের গায়ে কারও ছাপ পড়ে গেছে। কয়লার গায়ে অনেক সময় গাছের ডাল বা পাতার ছাপ দেখা যায়। এই সব পাথর বা ছাপের নাম ফসিল।

কালক্রমে সেই নদীর স্রোত বা সমুদ্র দূরে সরে গেছে কিন্তু সেই স্তরিত শিলার পাহাড় সেখানেই রয়ে গেছে, অনেক হয়ত ধ্বংস হয়ে গেছে। যা রয়ে গেছে তাই থেকেই আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি।

পৃথিবীর এই পাথরের বই, যার এক একটি পাতা এক একটি পাথর সেটিকে পণ্ডিতেরা মোট পাঁচ খণ্ডে ভাগ করেছেন। আসলে এই রকম কোনো বই নেই। বই এর এক এক খণ্ড মানে এক এক যুগ। সেই স্তরিত শিলায় যে সব ফসিল দেখা যায় তাদের বিষয় এই কথাটা মনে রাখা দরকার যে, যে ফসিল যত নীচে সে ফসিল তত পুরনো, কিন্তু সেই স্তরিত শিলার একেবারে নীচের স্তরে কোনো জীব বা গাছের চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায় নি। তার ওপরের স্তরে যাদের ফসিল পাওয়া গেল তারা সব জলে বাস করত। এই থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন

যে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল ডাঙায় নয় জলে। ডাঙার ফসিল পাওয়া গেল ওপরের স্তরিত শিলায়।

এই পাঁচটি যুগের এক একটি যুগ চলেছিল কয়েক কোটি বছর ধরে। পৃথিবী কত বুড়ো তার একটা হিসেব নেওয়া যাক। আমরা যদি কল্পনা করি যে পৃথিবীর বয়স মাত্র এক বছর তাহলে দেখা যাবে যে প্রথম আট মাস, অগ্রহায়ণ মাসের শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কিছুই ছিল না যাদের প্রাণ আছে বা যারা জীবিত। পৌষ মাস থেকে প্রাণের লক্ষণ দেখা গেল। তখন যে সব জীবিত প্রাণী দেখা গেল সেগুলি খুব ছোট, এত ছোট যে খালি চোখে দেখা যায় না। পৌষ আর মাঘ, এই দু' মাসে এরা একটু একটু বড় হতে হতে জেলি ফিশ পর্যন্ত বড় হল। স্তন্যপায়ী জীব এল পৃথিবীতে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি, মানুষ এল ৩১শে চৈত্র রাত্রি পৌনে বারোটায়। বারোটা বাজতে এক মিনিট মানে মাত্র ষাট সেকেণ্ড সময়ের লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে যেদিন ঘুম আসে না সেদিন কত কি চিন্তা মাথায় ঘোরে। ছোট ছেলেরা ভাবে অঙ্কের টাস্ক, ছোট কাকার বকুনি, নতুন একটা ফাউণ্টেন পেন, বুড়োরা ভাবেন চালের দাম, মেয়ের বিয়ে, আরও কতকি। এসব চিন্তাও যেমন ঘোরে তেমনি কারও কারও মাথায় আবার এমন চিন্তারও উদয় হয় যে 'আমি কোথা থেকে এলুম, আমার বাবা মা, তাদের বাবা মা', ভাবতে ভাবতে পৃথিবী কোথা থেকে এল, এই সব নানারকম অদ্ভুত সব চিন্তা মাথায় ঘুরতে থাকে।

কোন কূলকিনারা পাওয়া যায় না। ভাবতে ভাবতে এক সময়ে তারা ঘুমিয়ে পড়ে।

সত্যিই ত। প্রশ্ন বড় কঠিন।

পৃথিবীতে মোটামুটি দুশো কোটি লোক আছে। সভ্য ভব্য ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, কালো ফর্সা, লম্বা বেঁটে, এত সব নানা রকমের লোক এক দিনেই ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠেনি। তাহলে তারা কোথা থেকে এল ?

আমাদের পৃথিবী এখন যেমন দেখতে, গোড়ায় এমন ছিল না, এ কথা আগেই বলেছি। এক সময়ে পৃথিবী ছিল একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। সেই জ্বলন্ত পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগে গেল। ঠাণ্ডা হবার পর দেখা গেল যে শুকনো পৃথিবীর ওপরে এধারে ওধারে কতকগুলো খাড়া খাড়া উঁচু পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারপর পৃথিবীতে একদিন ভীষণ বৃষ্টি নামল, এতদিন ধরে সেই বৃষ্টি চলল যে পৃথিবীর নীচু জায়গা ডুবে গিয়ে সাগর, মহাসাগর, হ্রদ, আর ছোট বড় জলাশয়ের সৃষ্টি হল। ক্রমশঃ পৃথিবী আরও ঠাণ্ডা হল, এইবার কোনো জীব বাস করতে পারে।

জীব বলতে বোঝায় যার জীবন অর্থাৎ প্রাণ আছে। জীব হল যে খাবার খায়, নিশ্বাস নেয়, নড়তে চড়তে পারে আর নিজের মতো জীব সৃষ্টি করতে পারে। সেই পুরনো পৃথিবীতে ঠিক কবে আর কী ভাবে প্রথম জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল সে কথা বলা খুব শক্ত।

এ নিয়ে পণ্ডিতেরা অনেক পরীক্ষা করেছেন, অনেক কিছু গবেষণা করেছেন। তাঁরা বলেন যে বৃষ্টির পর যে অনেক সমুদ্র, হ্রদ আর জলাশয়ের সৃষ্টি হল তারই কোনো একটি জলাশয়ে

একদিন খুব ছোট্ট, এত ছোট যে খালি চোখে দেখা যায় না, তেমন একটি প্রাণীর আবির্ভাব ঘটল। মনে করা যাক তার নাম অ্যামিবা। এই অ্যামিবার হাত, পা, চোখ, কান কিছুই ছিল না। খুব পাতলা, স্বচ্ছ, চটচটে এক ফোঁটা একটুখানি একটা কিছু আর কি! তার মাঝখানে ঘন একটা বিন্দু। এই হল অ্যামিবার অতি সাধারণ সরল চেহারা।

অ্যামিবা খুব কম সময়ে তার দেহকে দু' ভাগে ভাগ করে দুটি অ্যামিবার সৃষ্টি করতে পারত, দুটি আবার চারটি হতেও দেরী হত না। খাবার সময় তারা দুটো শুঁড় বার করে খাবারটাকে ঘিরে ফেলে, তারপর নিজের সেই চট্‌চটে জিনিসটা দিয়ে খাবারটাকে ঢেকে দিত, কিছুক্ষণ পরে দেখা যেত খাবার হজম হয়ে গেছে। খাবারটা অবশ্য তার ছোট্ট দেহের চেয়েও ছোট। এই অ্যামিবা আজও আছে। ময়লা পুকুরের এক ফোঁটা জল নিয়ে মাইক্রোস্কোপের তলায় দেখলে অ্যামিবার দর্শন পাওয়া যেতে পারে।

অ্যামিবার ঐ চট্‌চটে জিনিসটির নাম প্রোটোপ্লাজম আর ঘন বিন্দুটির নাম নিউক্লিয়াস। বাড়ি যেমন অনেক ইঁটের তৈরি, মানুষ, জীবজন্তু বা গাছপালার শরীর তেমনি অনেক কোষ বা সেল্‌-এর দ্বারা তৈরি। এক একটি সেল্‌ যেন এক একটি অ্যামিবা। অ্যামিবার মতই প্রত্যেক সেলে আছে প্রোটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়াস। তাই অ্যামিবার নাম এক-কোষী প্রাণী। অ্যামিবার মতো এমন প্রাণী আরও আছে, যেমন প্যারামিসিআম, ইউগ্লিনা।

এই অ্যামিবারা পৃথিবীতে কত লক্ষ বছর যে ভেসে বেড়িয়েছিল কে জানে। ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ

কতকগুলি অভ্যাস আয়ত্ব করেছিল। কেউ রোদে বেশ থাকতে পারত; আবার কেউ রোদে থাকতে পারত না, তারা ছায়া পছন্দ করত; কেউ ভেসে বেড়াত জলের ওপর, কেউ জলের নীচে। ভারী অদ্ভুত! আবার কেউ কেউ ছিল, জলের গায়ে যে পাথর আছে তারা সেই পাথরে লেগে থাকত। ঐ রকম লেগে থাকতে থাকতে দেখা গেল যে তারা আর পাথর ছেড়ে আসতে পারছে না। তারা সব শ্যাওলা হয়ে গেছে, তাদের ফিকে সবুজ রংও হয়েছে। এই রকম শ্যাওলা আজও দেখা যায়। এই শ্যাওলা থেকেই আস্তে আস্তে পৃথিবীর সব গাছ জন্মেছে।

ঐ শ্যাওলার মধ্যে কোনো শ্যাওলা হয়ত লম্বা হল, কোনো শ্যাওলা হয়ত জল ছেড়ে ভিজে মাটিতে জন্মাতে শিখল, শেকড় গজাতে আরম্ভ করল, ভিজে মাটি থেকে শুকনো মাটিতে শেকড় চালিয়ে লম্বা লম্বা শ্যাওলা জন্মাল। তখন তাদের শ্যাওলা বললে ভুল বলা হবে। তাদের গাছ বলাই ভাল। সে সব গাছের ডাল বা গুঁড়ি ছিল না, পাতা ছিল না, ফুল ফুটত না, আধা শক্ত, আধা নরম কচু গাছের মতো কতকগুলো ডাঁটার সমষ্টি ছিল এই সব গাছ। পৃথিবীর কঠিন বুকে আর প্রখর সূর্য কিরণে বেঁচে থাকবার জন্যে তারা নিজেদের ক্রমশঃ শক্ত করতে শিখল।

ও দিকে আবার যে সমস্ত অ্যামিবা জলের নীচে চলে গিয়েছিল তারা গুঁড়ি মেরে হাঁটার উপযুক্ত পা (বিছের মতো) তৈরি করে ফেলল।

ধীরে ধীরে মানুষ এল

সেই এক ফোঁটা অ্যামিবা থেকে মাটিতে গাছ জন্মাল আর জলের তলায় একে একে ছোট ছোট কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী, জেলি মাছ আর আঁশওয়ালা মাছ জন্মাল।

এদের মধ্যে একদল প্রাণী ডাঙায় উঠতে শিখল। তারা জলেও থাকতে পারত আবার ডাঙাতেও তাদের অসুবিধে হত না, যেমন কুমীর বা ব্যাঙ জলেও থাকে আবার ডাঙাতেও থাকে।

ডাঙায় উঠতে উঠতে তাদেরই মধ্যে একদল আর জলে ফিরে গেল না। তারা ডাঙাতেই রয়ে গেল। তারা তাদের দেহ ডাঙায় বাস করার উপযোগী করে তৈরি করে নিল, মাটিতে চলবার মতো পা তৈরি করে নিল। তাদের মধ্যে অনেক প্রাণীর চেহারা বিরাট বড় হল, কোথায় লাগে তাদের কাছে হাতী। বায়োস্কোপের ছবিতে এই সব জন্তুর ছবি দেখা যায়। এদের আকার যত বড় নামও তত বড়, যেমন, বন ট্রোসাওরাস, মেগালোসাওরাস ইত্যাদি।

কতকগুলি জন্তু উঁচু গাছের ডালে বাসা বেঁধেছিল। তাদের পা কোনো কাজে লাগত না, এক ডাল থেকে আর এক ডালে যাবার সময় তারা লাফিয়ে লাফিয়ে যেত। এই সকল জন্তুই কালক্রমে পাখি হল। সে যুগের এক পাখির নাম টেরোড্যাকটিল।

পৃথিবী এই সময় বিরাট বিরাট জীবজন্তু আর লম্বা লম্বা গাছপালায় ভর্তি ছিল। ঐ সব জন্তুর বিরাট শরীরের তুলনায় মাথা ছিল খুব ছোট, তার মানে বুদ্ধি ছিল না। এই সব

অতিকায় জন্তু তাদের বিরাট দেহ নিয়ে সহজে চলাফেরা করতে পারত না, ইচ্ছামতো খাবার যোগাড় করতেও পারত না।

এদের রাজত্ব হয়ত দশ বিশ লাখ বছর চলেছিল। তারপর



কি হল কেউ বলতে পারে না, পৃথিবীতে আবহাওয়া বদলের জন্যে হবে হয়ত, কিংবা ঘন ঘন ভূমিকম্পের জন্যে, কিংবা একসঙ্গে এই দুই কারণের জন্যে ঐ সব জন্তু মরে গেল, গাছপালাও মরল। জীবজন্তুর মৃতদেহ আর মরা গাছপালা

ক্রমশঃ মাটির নীচে তলিয়ে গেল। মাটির নীচে অনেক দিন ধরে চাপ আর তাপ পেয়ে গাছপালাগুলি হল কয়লা আর জন্তুদের দেহ চুঁইয়ে বেরুল পেট্রল।

এই সকল অতিকায় জন্তুদের পরে পৃথিবীতে নতুন একদল জীব এল যারা তাদের বাচ্ছাদের স্তন্য পান করাতো, এদের নাম দেওয়া হল স্তন্যপায়ী বা ম্যামাল। এরা এদের বাচ্ছাদের যত্ন নিত, অন্য জন্তুদের মত অবহেলা করত না। তখনকার স্তন্যপায়ী অনেক জীব এখনও বেঁচে আছে তবে সেরকম চেহারা আজ আর তাদের নেই, অনেক বদলে গেছে।

এই স্তন্যপায়ী জীবেদের মধ্যে একদল আর সকলকে ছাড়িয়ে গেল। তারা চট্‌পট্ খাবার যোগাড় করতে শিখল, দল বেঁধে বাস করতে শিখল, সামনের পা দিয়ে জিনিস ধরতেও পারত। তারপর একদিন সে পিছনের পা দিয়ে দাঁড়াতেও শিখল। এরা না ছিল বাঁদর না হনুমান, মানুষত নয়ই, বরঞ্চ বলা যেতে পারে বানরের মতো মানুষ।

তারা শিকার করতে শিখল, বিপদের ভয়ে দল বেঁধে ঘোরাফেরা করত, বিপদ দেখলে গলার আওয়াজ করত, বাচ্ছাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিত।

আসল মানুষ বলতে যা বোঝায় সে কখন ও কোথায় জন্মেছিল সে বিষয়ে এখনও ঠিক করে কিছু বলা যায় না। তবে সেই প্রথম মানুষের চেহারা ভাল ছিল না। তারা মাথায় আমাদের চেয়ে খাটো ছিল, প্রখর রোদ আর শীতে তাদের চামড়ার রং হয়েছিল ঘোর বাদামী আর খসখসে। তখনও তারা কিছু পরতে শেখেনি। মাথার চুল ছিল লম্বা, হাত, পা আর গায়েও লোম ভর্তি, হাতের আঙুল বাঁদরের মতো সরু, কপাল

ছোট, চোয়াল উঁচু আর শক্ত। বাস করত গভীর জঙ্গলে, খেত কাঁচা পাতা, ফলমুল। ছোটখাটো জীবজন্তু তারা কাঁচাই খেত, কখনও সখনও পাখির বাসা থেকে হয়ত ডিম চুরি করত।

আদিম কালের সেই মানুষ

আদিম কালের সেই মানুষ দিনের বেলাটা খাবারের সন্ধানে নয়ত শিকার করে কাটাত। সন্ধ্যা হবার আগেই সে তার সঙ্গিনী আর বাচ্ছাদের নিয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিত। সে সময়ে চারদিকে হিংস্র জন্তুর ভয় ছিল। তারা তখনও কোনো অস্ত্রের ব্যবহার জানতনা তবে পাথর ঘসে ঘসে অস্ত্রের মতো কিছু তৈরি করেছিল। হয়ত দেখেছিল যে ভোঁতা পাথর অপেক্ষা ছুঁচলো পাথর ছুঁড়ে মরলে শত্রুর গায়ে বেশি জোরে লাগে। তখন তারা পাথর ঘসে ঘসে কিছু অস্ত্র তৈরি করেছিল, তার নমুনা এখনও কিছু কিছু পাওয়া যায়।

কিছু কিছু ভাষাও নাকি তারা জানত, যেমন হয়ত চিৎকার করে জানিয়ে দিত "একটা বাঘ", অন্য আর এক রকম আওয়াজ করে জানাত "এক পাল হাতী"।

কোনদিন কেউ হয়ত দেখল যে বনে একটা বড় গাছ যখন আর একটা বড় গাছের গা ঘেঁষে পড়ে যাচ্ছিল তখন দুটো গাছের ঘর্ষণে আগুন জ্বলে উঠল, সেই আগুন দাউ দাউ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, আগুনের তাপ সহ্য করতে না পেরে সে এবং অন্য বন্য জন্তুরাও হয়ত সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিল, কিংবা হয়ত আগ্নেয়গিরি থেকে আগুনের ফুল্‌কি উড়ে এসে গাছে আগুন ধরে গিয়েছিল। বনের পশুরা

ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তাই দেখে আদিম মানুষ শিখল কাঠে কাঠে ঘসে আগুন জ্বালাতে কিংবা জ্বলন্ত বন থেকে আগুন তুলে এনে গুহার সামনে জ্বালিয়ে রাখত, তাতে বনের জন্তুরা ভয় পেয়ে গুহার কাছে আসতে সাহস করত না; আর এক মজা, শীতের সময় আগুনের তাপ ভালই লাগত।

ছোট ছোট পশু পাখি যা তারা ধরত তা তারা কাঁচাই খেত কিন্তু হঠাৎ একদিন একটা মরা পাখি কি একখণ্ড একটা কাঁচা মাংস আগুনে পড়ে গেল। গুহায় আর খাবার না থাকাতে ক্ষিদের মুখে সেই পোড়া মাংসই খেতে হল। খেতে ভালই লাগল।

আর একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে তারা পাহাড়ের গুহার ভেতরে পাথরের গায়ে ছবি আঁকতে পারত। সে সময়ের অনেক জীবজন্তু, যেমন লোমওয়ালা হাতী বা বল্গা হরিণের ছবি তারা এঁকে রেখেছে। স্পেন দেশের উত্তরে পিরেনিজ পাহাড়ে এবং ফ্রান্সের কোনো কোনো পাহাড়ের গুহায় এই রকম ছবি এখনও দেখা যায়। কতকগুলি ছবি আবার রঙীন।

যে যুগের মানুষদের কথা বলা হল তারা হল পুরনো পাথর যুগের বা পেলিওলিথিক যুগের মানুষ।

এইবার একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। উত্তর দিক থেকে বরফের স্রোত নেমে এসে ইংলণ্ড, জার্মানি পর্যন্ত ঢেকে গেল। সেই কঠিন শীতে বহু লোক ও পশু মারা গেল, যারা বেঁচে রইল তারা আরও দক্ষিণ দিকে গরম দেশে পালিয়ে এল। তখন বোধহয় ভূমধ্যসাগর ছিল না কয়েকটি হ্রদ ছিল সেখানে।

সেই কঠিন শীত থেকে বাঁচবার জন্যে মানুষ চামড়ার পোশাক পরতে শিখল, তার শরীরের লোমও একটু একটু করে কমতে লাগল।

তারপর বরফ আবার উত্তর দিকে সরে গেল, নতুন নতুন বন জেগে উঠল মধ্য এশিয়া আর ইয়োরোপের ফাঁকা মাঠে আর সেই সঙ্গে জেগে উঠল আরও বুদ্ধিমান মানুষের দল। এদের নাম হল নিওলিথিক বা নতুন-পাথর যুগের মানুষ। এরাও পাথরের অস্ত্রই ব্যবহার করত কিন্তু সেগুলি ছিল আরও ভাল, আরও ধারালো।

এই নতুন-পাথর যুগের মানুষেরা চাষ করতে শিখেছিল, খাবার সম্বন্ধে তাদের অনেকটা ভাবনা কমে গিয়েছিল, শিকারের ওপর আর পুরোপুরি নির্ভর করতে হত না। মাটির পাত্র তৈরি করতেও শিখল তারা আর শিখল কুকুর, ছাগল, ভেড়া আর গরু পুষতে।

গুহায় বাস তারা ছেড়ে দিয়েছে। তারা এখন কুঁড়ে বানাতে পারে। বনের বড় বড় পশুর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে কোনো হ্রদের মাঝখানে ভারা বেঁধে তার ওপর একসঙ্গে অনেকগুলি কুঁড়ে তৈরি করে সেইখানে তারা বাস করত। হ্রদের মাঝখানে যখন তারা যেতে পারত তখন নিশ্চয়ই ভেলা বা নৌকো তৈরি করতেও শিখেছিল। ক্রমে তারা ধাতুর ব্যবহার শিখল, শণের আঁশ বুনে সুতো তুলতেও শিখল।

তারপর এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল। ভূমধ্যসাগরের জায়গায় যেখানে অনেকগুলি হ্রদ ছিল তারই একটা হ্রদ আর আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝে পাথরের যে বাঁধ ছিল সেটা একদিন ভেঙে গেল, ফলে আটলান্টিক মহাসাগরের জল এসে ভূমধ্যসাগরের সব হ্রদগুলি একাকার করে পুরো ভূমধ্যসাগর তৈরি হল। আটলান্টিক মহাসাগরের সেই ভীষণ বন্যার কথা বাইবেলে লেখা আছে। বন্যার পর সুরু হল নতুন যুগ। এ যুগের সব ইতিহাস পাওয়া যায়, মনগড়া কিছু তৈরি করতে হয় না।

ডারুইন

"তুমি একটি অপদার্থ, কেবল পাখী শিকার, ইঁদুর ধরা, ঘোড়ায় চড়া আর কুকুর নিয়েই তুমি আছ। তুমি ত গোল্লায় যাবেই, সেই সঙ্গে তোমার বংশেরও নাম ডোবাবে দেখছি"।

এই কথাগুলি বলেছিলেন ডাঃ রবার্ট ডারুইন তাঁর ছেলে চার্লস ডারুইনকে। ডারুইন বলতে আমরা চার্লস ডারুইনকেই



বুঝি "অরিজিন অফ স্পিসিস" নামে তিনি এক বই লিখেছিলেন। এই বই সারা পৃথিবীতে যে ভীষণ আলোড়ন তুলেছিল তেমন আলোড়ন বিজ্ঞানের আর কোনো বই নিয়ে হয়নি। ডারুইন তাঁর বইয়ে লিখেছেন যে পৃথিবীতে সমস্ত জীব জন্তু পশু পক্ষী পোকামাকড় গাছপালা এদের মধ্যে বেঁচে থাকবার জন্যে একটা লড়াই চলেছে। লড়াই যে চলছে তা কেউ বুঝতে পারছে না কিন্তু চলছে। সেই লড়াইয়ে যারা জয়ী হয়েছে তারা

আজও বেঁচে আছে, যারা জিততে পারেনি তারা কবে মরে শেষ হয়ে গেছে। এখনও অনেকে লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছে, তারা ক্রমশঃ শেষ হয়ে যাচ্ছে। যারা ভাল করে লড়াই করতে পারছে তারা ক্রমশঃ উন্নতি করছে।

সাধারণের ধারণা ডারুইন বুঝি বলেছেন যে বানর থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। ঠিক ঐ কথা তিনি বলেননি। তিনি বলেছেন যে সকল মানুষ নিম্নস্তরের একই কোন জীব থেকে ক্রমশঃ উন্নতি সাধন করে নিজেদের সুসভ্য জাতিতে পরিণত করেছে।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে বিরাট বিরাট সব জন্তু ছিল। তাদের চেহারা যত বড় ছিল মাথাটা সেই তুলনায় খুব ছোট ছিল। তাদের বুদ্ধি কিছুই ছিল না। তারা লড়াইয়ে হেরে গেছে। আজকের টিকটাক, গিরিগিটি বোধহয় তাদেরই বংশধর। একদিন এরা বড় ছিল।

ডারুইনের তুল্য বড় বিজ্ঞানী খুব কমই জন্মেছে। ওয়েস্ট মিনিস্টার গির্জায় ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ট বিজ্ঞানী নিউটনের পাশে তাঁর সমাধি আছে।

ইংলণ্ডের স্রুসবেরিতে ১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী ডারুইন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ঠাকুর্দা ইরেসমাস ডারুইন একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন, বাবা ছিলেন নাম করা ডাক্তার।

স্রুসবেরির স্কুলে তিনি যখন পড়তেন তখন গ্রীক আর ল্যাটিন পড়া অপেক্ষা পোকামাকড় আর প্রজাপতি সংগ্রহ করা কিংবা পাখির জীবনযাত্রা লক্ষ্য করার দিকে তাঁর বেশি মন ছিল। তাঁর বাবা ত ধরেই নিয়েছিলেন যে ছেলের কিছুই হবে না।

তাঁকে জোর করে এডিনবরায় পাঠানো হল ডাক্তারী পড়বার জন্যে। কোনোরকমে দু' বছর পড়লেন। সেকালে অজ্ঞান না করে যেভাবে রোগীদের দেহে ফোড়া বা অন্য কিছু কাটবার জন্যে ছুরি চালানো হত তা ডারুইন দেখে সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

এবার তাঁকে পাঠানো হল কেম্ব্রিজে, গ্রামের পাদ্রী হবার জন্যে শিক্ষা নিতে। কেম্ব্রিজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক, হেনলো সাহেবের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। সেখানে তিনি বিজ্ঞানের অনেক বই পড়লেন। প্রকৃতিতে এই যে এত রকম কীট পতঙ্গ পশু পাখী রয়েছে তাঁর আগ্রহ হল, তাদের বিষয় ভাল করে জানতে। ১৮৩১ সালে কেম্ব্রিজে পড়া শেষ করে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।

যা তিনি চাইছিলেন তার একটা সুযোগ জুটলো। সেই বছরই একটা ছোট জাহাজ যাবে দক্ষিণ আমেরিকা উপকূল বরাবর, আর অস্ট্রেলিয়া আর আরও অন্য দেশে পৃথিবীর মানচিত্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে। পাঁচ বছর পরে জাহাজটি ফিরে আসবে। সেই জাহাজে একজন বিজ্ঞানী চাই যে পশুপক্ষী সম্বন্ধে আর অন্য অন্য বিষয়ে খোঁজ খবর করবে। কোনো মাইনে নেই।

কেম্ব্রিজের সেই বন্ধু অধ্যাপক হেনলো ডারুইনের নাম পাঠালেন। ডারুইনের বাবা রাজি নয়। তাঁর মামা ওয়েজউড তিনিও একজন বিজ্ঞানী, জানতে পেরে তিরিশ মাইল দূর থেকে ঘোড়ার জুড়ি হাঁকিয়ে এসে বাবাকে ধরলেন। তখন ডারুইনের বাবা রাজি হলেন।

তিনি ত রাজি হলেন, এদিকে জাহাজের ক্যাপ্টেন, রবার্ট ফিজরা, তিনি ডারুইনকে নেবেন না। তিনি বললেন, যার নাক এ রকম বিশ্রী সে লোকের সমুদ্র যাত্রায় মনের জোর থাকে না। শেষ পর্যন্ত সে বাধাও দূর হল। তবে পাঁচ বছরের মধ্যে জাহাজটি যখনই সমুদ্রে থাকত তখনই ডারুইন সামুদ্রিক পীড়ায় কষ্ট পেতেন।

সমুদ্রে দুলতে দুলতে ডারুইন নানা দেশে যাচ্ছেন, জীবজন্তু সম্বন্ধে নানা টুকিটাকি তাঁর নোট বইয়ে লিখে নিচ্ছেন আবার কিছু কিছু নমুনা সংগ্রহও করছেন। মাঝে মাঝে ঐ সামুদ্রিক পীড়াটা ছাড়া তাঁর বেশ ভালই লাগছে। কাজে ফাঁকি দেবার লোক ত তিনি নন। তিনি এসেছেন শিখতে। এই সমুদ্র যাত্রাই তাঁর জীবনের গতি বদলে দিয়েছিল। তিনি পৃথিবীকে নতুন এক বৈজ্ঞানিক তথ্য দান করলেন।

জাহাজ ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল থেকে ৫০০ মাইল দূরে গ্যালাপাগস দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছলো। এইখানে এসে ডারুইন অবাক হয়ে গেলেন। তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন যে এখানে যত দ্বীপ আছে তাদের সবেরই মাটি আর জলবায়ু এক, এখানকার জীবজন্তুগুলির সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার জীবজন্তুর মিল আছে কিন্তু তবুও তারা এক নয়; তফাৎ রয়েছে, যেমন একজন নিগ্রোর সঙ্গে একজন চীন দেশের লোকের তফাৎ আছে অথচ দুজনেই মানুষ। যেমন, তিনি এক রকম পোকা দেখলেন, যেগুলির একটা দ্বীপে ছোট ছোট ডানা রয়েছে তারা ওড়বার চেষ্টা করছে কিন্তু যখনই জোর হাওয়া দিচ্ছে তখনি তারা উড়ে সমুদ্রে পড়ছে, পড়ে মরে যাচ্ছে। অথচ সেই একই পোকা আর এক দ্বীপে রয়েছে, যাদের ডানা নেই, তারা বেশ

দিব্যি বেঁচে রয়েছে। এ দ্বীপের পোকারা বুঝেছে যে উড়তে যাওয়া মানে মরা অতএব তারা ওড়া ত্যাগ করেছে, ডানা কাজে না লাগায় শেষ পর্যন্ত আর ডানা গজায়নি।

কি করে এমন হয় এই বিষয়ে খোঁজ করতে গিয়েই তিনি আবিষ্কার করলেন যে পৃথিবীতে যারা বেঁচে থাকবার যোগ্য তারাই বেঁচে রয়েছে।

দেশে ফিরে দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে তিনি অনেক পড়লেন, খোঁজ-খবর আর গবেষণা করে তবে তাঁর আবিষ্কার সকলকে জানালেন।

ডারুইন যে জিনিসটি ভেবেছিলেন ঠিক সেইটি আরও একজন ভেবেছিলেন, তাঁর নাম অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস। ডারুইন বা ওয়ালেস জানতেন না যে দুজনেই একই অজানা ব্যাপার জানবার চেষ্টা করছেন।

ডারুইন তাঁর তথ্য প্রকাশ করে মান অপমান দুই লাভ করেন। তাঁর বইখানা ত প্রকাশক প্রথমে ছাপতে রাজি হয়নি। তবে শেষ পর্যন্ত ডারুইন জয়ী হয়েছেন।

১৮৮২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

শরীর একটা আশ্চর্য কারখানা

ছোট ছেলেরা যখন মাঠে ফুটবল খেলে তখন তাদের মধ্যে যদি কেউ বল নিয়ে দৌড়তে শুরু করে তখন তার উল্টো পার্টির খেলোয়াড়রা পিছনে পিছনে তাকে তাড়া করে বলটা তার পা থেকে কেড়ে নেবার জন্যে। কিন্তু কই গোল পোস্ট তাকে তাড়া করেছে বলে ত কখনও শোনা যায়নি।

তা কি করে হবে? গোলপোস্ট ত মাটিতে পোঁতা আছে, তা ছাড়া ওটা ত কাঠ। আসল কথা হল গোল পোস্টটা কাঠ বটে কিন্তু তার প্রাণ নেই। যত জিনিস দেখা যায় তাদের মধ্যে কারও প্রাণ আছে, যেমন ছোট খোকা তার ভাই, বোন, পোষা কুকুর, পাখি, টবের গাছগুলো। অনেকের আবার প্রাণ নেই, যেমন বসবার চেয়ার, ফাউণ্টেন পেন, বোনের টিফিনের কৌটো।

তা বলে রেলগাড়ি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে বলে যে তার প্রাণ আছে সে কথা ঠিক নয়, কিংবা ঐ খুব বুড়ো লোকটি নিজের ইচ্ছে মতো উঠে দাঁড়াতে বা চলতে পারে না বলে তার প্রাণ নেই, সে কথাও ঠিক নয়। কেঁচো মাটি ফুঁড়ে ওঠে বলে যে সে গাছ, এই কথা শুনতে হবে না কি?

তাহলে কি হল? পৃথিবীতে যা কিছু দেখা যায় তাদের মধ্যে একদল হল সজীব, যাদের প্রাণ আছে, আর বাকি সব মৃত।

কি কি গুণ থাকলে তাকে সজীব বলব?

তারা নিজেরা নড়াচড়া করতে পারে। ইচ্ছামতো যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারে।

তারা খায়, হজম করে।

তারা নিশ্বাস নেয়।
তাদের বুদ্ধি আছে।
তারা নিজেদের মতো আরও জীব তৈরি করতে পারে। তাদের আঘাত করলে লাগে।
প্রাণ ধারণের জন্য তারা সূর্যের ওপর নির্ভর করে।
তারা নিয়ম মেনে চলে। যা ইচ্ছে বা যখন ইচ্ছে খেলে চলবে না, যখন ইচ্ছে ঘুমুবো, যা ইচ্ছে পরব, তা করলে চলবে না। তাদের নিয়ম মানতে হয়।

আমাদের শরীরটা খুব ভাল একটা কারখানা। সত্যিই, শরীরের চেয়ে এত ভাল কারখানা আর কোথাও নেই। মানুষ না মরা পর্যন্ত শরীরের প্রত্যেকটি অংশে কাজ চলে। কাজ থামলে বুঝতে হবে যে মানুষ মরে গেছে। যেই কাজ থেমে গেল তাকে আর চালানো যাবে না, ঘড়ি নয় যে দম দিলেই আবার চলবে।

শরীরটাকে একখানা বাড়িও বলতে পারা যায়। শরীরের হাড় দাঁত, নখ যেন দেহের কড়ি-বরগা, রেলিং চৌকাঠ; শরীরে যে সব পেশী আছে সেগুলি যেন ইট-পাথর, চামড়া যেন চুনকাম করা বাইরের দেওয়াল; রক্ত চলাচলের শিরা-উপশিরা যেন জল যাওয়া আসার পাইপ আর হৃৎপিণ্ড যেন সেই সব পাইপের পাম্প, ফুস্ফুস্ যেন ঘরে ঘরে হাওয়া চলাচল রাখবার একটা যন্ত্র, পাকস্থলী আর নাড়ীভুড়ি যেন রান্নাঘর, যকৃত হল ভাঁড়ার ঘর, মূত্রাশয় আর মলাশয় হল ড্রেন-পায়খানা; মাথার ভেতরে যে মগজ বা ঘিলু আছে তা হল টেলিগ্রাফ-যন্ত্র আর সরু সুতোর মতো

স্নায়ু-গুলি বা নার্ভ হল সেই টেলিগ্রাফের তার; ক্যামেরা হল চোখ আর কান হল শব্দগ্রহণের যন্ত্র।

সেই বাড়িখানা যেমন ইঁটের তৈরি, আমার আপনার বা সকলের শরীর, এমন কি পশুপাখি ও গাছপালার শরীর খুব ছোট ছোট সেল্ দিয়ে তৈরি। সেল্ এত ছোট যে খালি চোখে দেখা যায় না।

এখন থেকে প্রায় তিন শত বছর আগে হুক নামে একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী গাছ থেকে খুব পাতলা একটুখানি অংশ কেটে নিয়ে মাইক্রোস্কোপের নীচে লাগিয়ে দেখেছিলেন যে সেই পাতলা সামান্য অংশটুকুর মধ্যে অসংখ্য চৌকো বাক্স যেন পাশাপাশি ইঁটের মতো সাজানো রয়েছে। তিনি এদের নাম দিলেন সেল্। সেল্ কথার আসল মানে দেয়াল ঘেরা ছোট্ট কুঠুরি। জেল-খানার মধ্যে এই রকম সেল্ থাকে, দুষ্টু কয়েদীদের শাস্তি দেবার জন্যে সেই সেলে বন্দী করে রাখা হয়।

মানুষ, পশু পাখি আর গাছপালার মধ্যে যে সব সেল্ আছে তাদের সবগুলি চৌকো নয়, এদের আকার নানারকমের হয়। সেল্ কত ছোট হয়? সাধারণতঃ ২৫০০ সেল্ পাশাপাশি এক লাইনে রাখলে এক ইঞ্চি হতে পারে। একজন মানুষের শরীরে তাহলে নিশ্চয়ই অনেক সেল্ আছে। কত? একের পিঠে পনেরোটা শূন্য দিলে যত হয় ততগুলি সেল্ আছে। এতগুলি সেলের দলে দলে কাজ ভাগ করা আছে। হাড়ের সেল্, পেশীর সেল্, গ্রন্থির সেল্, শরীরের মধ্যে নানা দলে ভাগ করা অনেক দলের সেল্ আছে। তারা আমাদের অজান্তে ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়ম করে নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছে। এত নিয়ম ধরে কোনো বড় অফিস বা কারখানাও চলে না।

সেলের মধ্যে থাকে প্রায় স্বচ্ছ চট্‌চটে মত খানিকটা জিনিস, যার নাম প্রোটোপ্লাজম। প্রোটোপ্লাজম আসলে যে কি তা এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায়নি। অনেক অতি ক্ষুদ্র প্রাণী আছে যার দেহ বলতে একটি মাত্র সেল্ সম্বল, যেমন অ্যামিবা। মায়ের পেটে আমাদেরও জীবন আরম্ভ হয় একটি মাত্র সেল থাকে।

মানুষ চুপ করে বসে থাকলেও কিংবা ঘুমুলেও শরীরের ভেতরের কলকব্জারা কিন্তু চুপ করে বসে থাকে না বা ঘুমোয় না, তারা তাদের কাজ ঠিক করে যায়। শরীরের কলকব্জারা এই সব যে কাজ করে সে জন্য তাদের খাবার চাই।

কি কি খাবার চাই ?

শরীর গড়বার জন্যে কিছু খাবার যেমন মাছ, মাংস, ছানা, ডিম, মাখন, ডাল, জাঁতায় ভাঙা আটা, ঢেঁকিছাঁটা চাল। এই সব খাবারে একটি বিশেষ জিনিস থাকে, তার নাম প্রোটিন। শরীর গড়বার জন্যে প্রোটিন এর সমান কেউ নেই।

শরীরে শক্তি যোগাবার জন্যে কিছু খাবার যেমন গমের রুটি, ফ্যান সমেত ভাত, আলু, চিনি, গুড়, মাখন, ডিম, ঘি, মাখন, মার্গারিন, মাছ, মাংস। এই সব খাবারের মধ্যে আর একটি বিশেষ জিনিস থাকে, তার নাম কার্বোহাইড্রেট। এদের মধ্যে কতকগুলিতে আবার ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থ থাকে। এই সকল খাবার শরীরে কাজ করবার শক্তি যোগায়।

শরীর রক্ষার জন্যে কিছু খাবার যেমন যতদূর সম্ভব টাটকা শাকসব্জি যেমন পালংশাক, টোম্যাটো, গাজর, লেবু, ফল, তাছাড়া গমের রুটি এইসব। এইসব খাবারে আছে ভিটামিন আর নুন জাতীয় পদার্থ। এরা নানা রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে শরীরকে বিপদ থেকে রক্ষা করে।

দুধ হল কিন্তু সবচেয়ে ভাল খাবার। দুধের মতো ভাল খাবার নেই। ওপরে যে সব খাবারের নাম লেখা হল তার সবই দুধে আছে। যদি একটি মাত্র কোনো খাবার খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে তাহলে সেটি হল দুধ। দুধের গুণ অনেক। সুযোগ পেলেই দুধ খাবে। দুধে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন সব আছে।

বিজ্ঞানীরা খুব জ্ঞানী-গুণী লোক। তাঁরা সব কিছু মাপ করতে পারেন। শরীরের কতখানি ক্ষয়ক্ষতি হল এও তাঁরা যেমন মাপ করে বার করতে পারেন, তেমনি কতখানি ক্ষয়পূরণ হল তাও তাঁরা মাপ করে বলতে পারেন। আমাদের কতখানি খাওয়া দরকার তাও তাঁরা হিসেব করে ঠিক করে রাখছেন। তাঁরা বলেন যে সাধারণ একজন লোক, যে শ্রমিক নয় বা যাকে খুব ছুটোছুটি করতে হয় না তার প্রতিদিন অন্ততঃ তিন হাজার ক্যালরি খাবার দরকার।

ক্যালরি হল এক রকম মাপ। মোটামুটি দু' সের জলকে ° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড গরম করতে যেটুকু তাপ বা গরম দরকার সেটুকু তাপকে বলা হয় এক ক্যালরি। তাহলে যতখানি খাবার খেলে শরীরে ৩০০০ ক্যালরি তাপ তৈরী হবে ততখানি খাবার অন্ততঃ খাওয়া দরকার।

অত হিসেব করে অবশ্য খেতে পারা যায় না, তবে ইচ্ছে করলে ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে জেনে নিতে পারা যায় কতখানি ভাত খেলে কত ক্যালরি হবে বা কটা রসগোল্লা খেলে কত ক্যালরি হবে। আর শরীর যেমন সেই তুলনায় কোন খাবার কতখানি খাওয়া দরকার ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া উচিৎ।

যে ল্যাবরেটরীতে খাবার হজম হয়

আমরা যে খাবার খাই তা কি করে হজম হয় জানতে পারলে স্বীকার করতে হবে যে আমাদের শরীরের মধ্যে মস্ত একটা ল্যাবরেটরী আছে, যেখানে নানারকমের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি হচ্ছে ; সেই সব দ্রব্য খাবারকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে শেষ পর্যন্ত তাদেরও নতুন নতুন রাসয়নিক দ্রব্যে পরিণত করে শরীরের অসংখ্য সেলে যার যেমন দরকার তাকে সেইটি পাঠিয়ে দিচ্ছে। আর শেষ পর্যন্ত যে সব আবর্জনা পড়ে থাকছে, যাদের আর দরকার নেই তাদের শরীর থেকে বার করে দিচ্ছে।

মুখ থেকে আরম্ভ করে মলদ্বার পর্যন্ত রাস্তাটুকু ৩০ ফুট লম্বা। এই সমস্ত রাস্তাটিকে আমরা পৌষ্টিক নালী বলতে পারি। পৌষ্টিকনালীর প্রায় সবটাই আমাদের পেটের মধ্যে গুটিয়ে শুটিয়ে আশ্রয় নিয়ে বসবাস করে। পৌষ্টিকনালীতে অনেকগুলি ভাগ আছে। সে গুলির নাম হল মুখ, গ্রাসনালী, পাকস্থলী, গ্রহণী, ক্ষুদ্র অন্ত্র, বৃহৎ অন্ত্র, মল ভাণ্ডার আর মলদ্বার।

মুখে যখন আমরা দাঁত দিয়ে খাবার চিবুই তখন খাবারের সঙ্গে বেশ করে লালারস মিশে খাবারটিকে, হড়হড়ে করে দেয়। কার্বহাইড্রেট বা শর্করাজাতীয় খাবার, যেমন রুটি এই লালারসের সঙ্গে মিশে প্রায় হজম হয়ে যায়। ঐ যে পৌষ্টিকনালীর কথা বললুম, তার মধ্যে অনেক পেশী আছে যাদের কাজ হল খাবার-টাকে আস্তে আস্তে এগিয়ে দেওয়া।

মুখের মধ্যে খাবারটা চিবনো হয়ে গেলে তাকে আমরা গিলে ফেলি ; খাবারটা মুখ থেকে গিয়ে ঢোকে গ্রাসনালীতে,

গ্রাসনালী থেকে পাকস্থলীতে। পাকস্থলীতে অনেক রকম হজমী রস মিশে খাবারটাকে কাদার মতো করে দেয়। পাকস্থলীতে প্রোটিন বা আমিষজাতীয় খাবার যেমন মাছ, মাংস, মাখন ইত্যাদি হজম হয়।

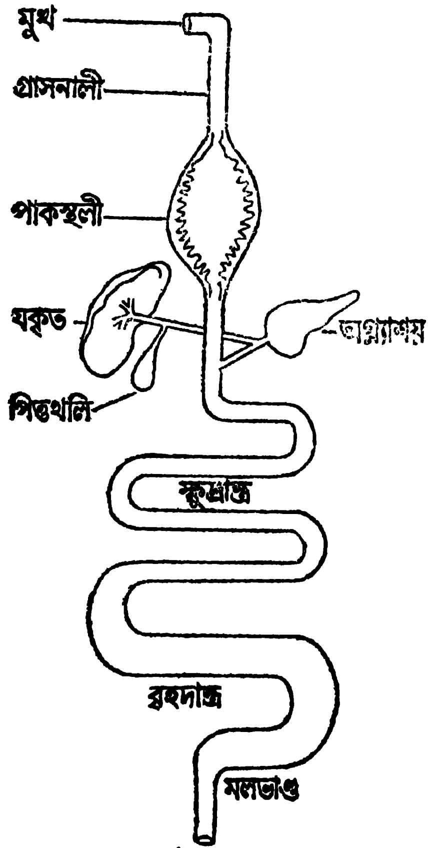
পাকস্থলী থেকে খাবার এসে পৌঁছয় গ্রহণী অংশ পার হয়ে ক্ষুদ্র অন্ত্রে। এই অংশটি খুবই দরকারী। নামে ক্ষুদ্র হলেও লম্বায় ২০ ফুট। পেটের মধ্যে গুটিয়ে থাকে বলে টের পাই না। এখানে খাবার যখন পৌঁছয় তখন সে কাদার মতো হয়ে গেছে। এর একদিকে আছে লিভার বা যকৃত। যকৃত থেকে খুব তেঁতো পিত্তরস বেরিয়ে পিত্তথলিতে জমা থাকে। অপর দিকে আছে অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস। প্যানক্রিয়াস থেকেও হজমী রস বেরোয়। ঐ পিত্তথলি আর প্যানক্রিয়াস থেকে আলাদা আলাদা দুটি সরু নল গিয়ে ক্ষুদ্র অন্ত্রে ঢুকেছে। খাবার যখন ক্ষুদ্র অন্ত্রে পৌঁছয় তখন ঐ দুটি সরু নল দিয়ে পিত্তরস আর অগ্ন্যাশয়ের হজমী রস এসে খাবারে মেশে। খাবার এইখানে পুরোপুরি হজম হয়।

পিত্তরসের অভাব হলে জনডিস বা 'ন্যাবা' রোগ হয়। অগ্ন্যাশয় খারাপ হয়ে গেলে ডায়োবেটিস নামে রোগ হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে খাবারের সার অংশগুলি রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় যে সব লক্ষ লক্ষ সেল আছে তাদের মধ্যে পৌঁছয়।

ক্ষুদ্রান্ত্র পার হয়ে সেই কাদা গিয়ে আড্ডা নিল বৃহৎ অন্ত্রে। কাদায় যে জল বাকি থাকে তা শরীর এইখানে শুষে নেয়। বাকি যা পড়ে থাকে তা নেহাৎই আবর্জনা। সেই আবর্জনা

অর্থাৎ মল পৌঁছয় শেষ স্টেশন মলভাণ্ডারে। মলভাণ্ডার থেকে মল মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায়।



পৌষ্টিকনালী

হজমের কাজটা এতই সহজে হয় না। ধাপে ধাপে অনেক কাজ হয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব ব্যাপারটা জানতে পারলে অবাক

হতে হবে। একটা কথা বেশ ভাল করে মনে রাখা দরকার যে শরীর সুস্থ রাখতে হলে নিয়ম মেনে চলতে হবে। নিয়ম মেনে চলা মানে প্রতিদিন যে সব কাজ আমাদের করতে হয় যেমন পাইখানা যাওয়া, স্নান করা, দাঁত মাজা, খাওয়া, এসব কাজ রোজ একই সময়ে করতে হবে। নিয়ম মেনে না চললেই অসুখ করবে।

ছেলেদের যখন স্কুল, বাবাদের যখন অফিস খোলা থাকে তখন ঠিক সময়ে খাওয়া দাওয়া, খেলাধূলো, পড়াশোনা, অফিস যাওয়া আসা করতে হয়, তাই শরীর মোটামুটি ভাল থাকে। গরমের ছুটি, পূজোর ছুটি বা অন্য ছুটির সময় যখন যা ইচ্ছে তাই করলে অসুখ-বিসুখে ভুগতে হয়।

আমরা রোজ যে সময়ে খাই সে সময়ে শরীরের ভেতরে যে সব হজম রস আছে সেগুলিও খাবারটাকে হজম করিয়ে দেবার জন্যে ঠিক সময়ে তৈরি হয়ে থাকে। যদি অন্যদিনের মতো এই সময়ে না খাই তাহলে সেই সব হজমী রস নষ্ট হয়ে যায়। পরে যখন খাব তখন আর হজমী রসের সাহায্য পাওয়া যাবে না কারণ তখন তারা আর সেখানে নেই। এজন্যে সেই খাবার হজম নাও হতে পারে। এই অনিয়মে খাওয়া হয়ত দু একদিন চলতে পারে, বেশিদিন চলতে পারে না, তাহলে কঠিন অসুখে পড়তে হবে। যাদের খাওয়ার সময়ের ঠিক নেই তারা পেটের কঠিন পীড়ায় ভোগে।

খাবার সময় মনটা যেন খাবার দিকেই থাকে। তখন বই পড়লে কিংবা রাগারাগি করলে হজমী রস ঠিক মতো বেরুতে পারে না। তার জন্যে হজমে ব্যাঘাত হতে পারে।

একবার খাওয়ার পর অন্ততঃ তিন ঘণ্টা আর কিছু খাওয়া উচিৎ নয়।

খেলাধুলো, ছোটাছুটি যাই করি না কেন, রোজ কিছু সময় নিয়ম করে কিছু ব্যায়াম করা দরকার। এতে শরীর মজবুত থাকে খাটবার ক্ষমতা অটুট থাকে। দরকারের সময় বেশি খাটুনি বা দৌড়ঝাঁপ সহ্য হয়।

আজকাল টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজনও লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি বলতে পারেন যে টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মেজে তাঁর দাঁতের রোগ কমেছে বা সেরে গেছে। তা যদি হত তাহলে টুথপেস্টের বিক্রি কমে যেত। টুথপেস্টে হয়ত কিছু উপকারী জিনিস থাকতে পারে কিন্তু অপকারী জিনিসও আছে।

দাঁত ভাল রাখতে হলে যে কোনো ভাল টুথ পাউডারই যথেষ্ট। কিন্তু দরকার হচ্ছে দাঁত অপেক্ষা দাঁতের মাড়ীর প্রতি বেশি মন দেওয়া। দাঁত মাজবার সময় ও মুখ ধোবার সময় প্রতি বারই ওপর আর নীচের মাড়ী আঙুল দিয়ে বেশ করে ঘসে নেওয়া উচিত।

কোনো মিষ্টি জিনিস, সে রসগোল্লা সন্দেশই হক কিংবা এক কাপ চা সরবৎই হক, খাবার কয়েক মিনিট পরেই মুখ ধুয়ে ফেলা উচিত। মুখের মধ্যে মিষ্টি জিনিস থাকলে তা অ্যাসিডে পরিণত হয়ে দাঁতের ক্ষতি করে। দাঁত সম্বন্ধে এই নিয়ম মেনে চললে খুব বুড়ো বয়সেও দাঁত খারাপ হবে না বা পড়বে না।

শরীর সহজে খারাপ হয় না। রোগের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করবার জন্যে আমাদের শরীর সব সময়ে চেষ্টা করে।

এমন কি শরীরের ভেতর থেকে অনেক দরকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বাদ দিলেও আমরা সহজে মরি না, তবুও নিয়ম মেনে চলতে হয়।

নিয়ম মেনে চলার মস্ত একটা সুবিধে এই যে শরীর ত ভাল থাকেই, অন্য কাজ করবারও সময় পাওয়া যায়।

অণু পরমাণুর গল্প

পদার্থ কাকে বলে ? ইঁট, কাঠ, লোহা, খড়ি, কালি কলম, জল, বাতাস, এসব পদার্থ। পদার্থ তিন রকম ঃ—কঠিন, তরল আর বায়বীয়। লোহা হল কঠিন পদার্থ, জল তরল পদার্থ আর অক্সিজেন হল বায়বীয় পদার্থ।

পৃথিবীতে যত পদার্থ আছে তাদের মোট দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক ভাগ হল মৌলিক পদার্থ, আর অপর ভাগের নাম হল যৌগিক পদার্থ। একটি মৌলিক পদার্থকে বিভিন্ন রকমের মৌলিক পদার্থে ভাগ করা যায় না। খাঁটি লোহাকে যতই ভাগ করা যাক না কেন শেষ পর্যন্ত সে লোহাই থাকবে কিন্তু যৌগিক পদার্থকে ভাগ করা যায়। জল যৌগিক পদার্থ। জলকে ভাগ করতে করতে এমন অবস্থায় আসবে যে যখন তাকে ভাগ করলে আর জল থাকবে না। তার পরও যদি জলকে ভাগ করা যায় তাহলে দুটি গ্যাস পাওয়া যাবে ; একটির নাম হাইড্রজেন আর অপরটির নাম অক্সিজেন। হাইড্রজেন আর

অক্সিজেন মৌলিক পদার্থ, এই দুই মৌলিক পদার্থ মিশে জল নামে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করেছে।

পৃথিবীতে মোট বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ তা সে কঠিন, তরল বা বায়বীয়, যাই হক না কেন, তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে কোনো না কোনো একটি নিশ্চয়ই আছে। এই বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে কেবলমাত্র মার্করি বা পারা এবং ব্রোমিণ তরল অবস্থায় পাওয়া যায় আর বাকি সব হয় কঠিন নয়ত বায়বীয়।

দুটি বা তার বেশি গ্যাস মিললে তরল পদার্থ পাওয়া যায়, যেমন হাইড্রজেন আর অক্সিজেন মিশে জল হয়। সেই জলকে খুব ঠাণ্ডা করলে জমে বরফ হয়ে কঠিন পদার্থ হয়। বরফকে আস্তে আস্তে গরম করলে জল হয়। জল তরল পদার্থ। জলকে গরম করতে থাকলে বাষ্প হয়ে উবে যায় যা হল বায়বীয় পদার্থ। ঐ বাষ্পকে ধরে ঠাণ্ডা করে আবার জল করা যায়।

কিন্তু দুটি গ্যাস আছে যারা দুজনে মিশলে তরল পদার্থ পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় একটি কঠিন পদার্থ যার নাম অ্যামনিয়ম ক্লোরাইড।

যদি খানিকটা জল নিয়ে ভাগ করতে থাকা যায় তাহলে তা ভাগ করতে করতে এমন একটা অবস্থায় আসা যাবে যখন তাকে আর ভাগ করা যাবে না। সে ভাগ এতই ছোট যে সেটুকু খুব সরু একটা ছুঁচের ডগায় তোলা যাবে। তারপরও কি ওকে ভাগ করা যায়? হ্যাঁ যায়, কিন্তু তা এতই ছোট যে তাকে আর খালি চোখে দেখা যায় না। সেই ছুঁচের ডগের সেই সামান্যটুকু জলকে অনেকগুলি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটি ভাগকে

বলা হয় জলের অণু-এর ইংরেজি নাম হল মলিকিউল।) এই অণুকেও ভাগ করা যায়, তবে সে আর তখন জল থাকে না। জলের অণু থেকে পাওয়া যাবে হাইড্রজেন আর অক্সিজেন গ্যাসের পরমাণু। হাইড্রজেন গ্যাসের দুটি পরমাণু আর অক্সিজেন গ্যাসের একটি পরমাণু মিশলে পাওয়া যাবে জলের একটি অণু। পরমাণুকে ইংরেজিতে বলে অ্যাটম।

আর একটা কথা জেনে রাখা দরকার যে মৌলিক পদার্থ থেকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় অণু আর যৌগিক পদার্থ থেকে পরমাণু।

অণু আর পরমাণুরা এতই ছোট যে তাদের আকারের কোনো স্পষ্ট ধারণা করা যায় না। আলপিনের ডগে যতটুকু জল উঠবে তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ অণু আছে। মাত্র এক বিন্দু জলকে যদি পৃথিবীর মতো বড় করা যায় তাহলে তার ভেতরে এক একটি অণুর আকার হবে এক একটি ছোট কমলা লেবুর মতো। এইবার যদি ঐ একটি কমলা লেবুর সাইজের অণুকে পৃথিবীর মতো বড় করা যায় তাহলে তার ভেতরে একটি পরমাণু ঐ কমলা লেবুর চেয়ে বড় হবে না।

অণু আর পরমাণুরা অত ছোট হলে কি হবে, বিজ্ঞানীরা তাদের ছাড়েননি। তাঁরা তাদের মাপ আর ওজন ঠিক করেছেন। প্রত্যেক রকমের অণু পরমাণুর নির্দিষ্ট মাপ ও ওজন আছে। কোনো একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর নিজস্ব গুণ আছে, যা আর কারও সঙ্গে মেলে না। যেমন লোহার পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেন পরমাণুর মিল নেই।

হাইড্রজেন গ্যাসের যে পরমাণু তার ওজন ঠিক করা হয়েছে ১, তার সঙ্গে তুলনা করে বাকি ৯১টি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর

ওজন ঠিক করা হয়েছে, যেমন অ্যালুমিনিয়ম পরমাণুর ওজন ২৭, সোনার পরমাণুর ওজন ১৯৭, সীসের ২০৭। সবচেয়ে ভারী হল ইউরেনিয়াম নামে ধাতুর পরমাণু, তার ওজন ২৩৮।

অণু আর পরমাণুদের আরও নানারকম গুণ আছে। তারা সব একসঙ্গে মিশে যেয়ে একটা পিণ্ড তৈরি করে না, নিজের নিজের স্বাধীনতা বজায় রেখে চলে। অনেকগুলি সন্দেশ একসঙ্গে চটকালে এক তাল বেশ বড় সন্দেশ পাওয়া যায় কারণ সন্দেশের অণুগুলি সব এক জাতের; কিন্তু সন্দেশের সঙ্গে সিঙ্গাড়া কিংবা আম মিশে এক তাল সন্দেশ, সিঙ্গাড়া কিংবা আম হয় না। এক কথায় এক জাতের অণু অপর জাতের অণুর সঙ্গে মেশে না।

কেউ হয়ত বলবে যে আমরা যখন সরবৎ খাই তখন জলে যে চিনি মেশাই সে চিনি ত বেমালুম জলে গলে যায়। এখানে ত দেখা যাচ্ছে দু' জাতের অণু বেশ মিশে যায়। এর উত্তর হল এই যে অণুগুলির মাঝে মাঝে ফাঁক থাকে। কঠিন পদার্থের অণুদের মধ্যে ফাঁক আরও বেশি থাকে আর বায়বীয় পদার্থের অণুদের মধ্যে ফাঁক সবচেয়ে বেশি। তাদের অণুগুলি যেন ছুটে পালিয়ে যেতে চায়। সেইজন্যে গ্যাস অত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। এখন সরবতের বেলায় হয় কি, চিনির অণুগুলি জলের অণুদের মধ্যে বেশি ফাঁক পেয়ে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। একটি পাত্রে যদি অনেকগুলি খেলবার মার্বেল গুলি রাখি তাহলে তাদের মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক থাকে। খানিকটা বালি বা জল ঢেলে দিলে ফাঁকে ফাঁকে ঠিক ঠিক চলে যায় অথচ পাত্র উপচে পড়ে যায় না। সরবতের বেলায়ও ঠিক তাই

হয়। এই সরবতকে গরম করলে জল আস্তে আস্তে বাষ্প হয়ে উবে যায়। বাষ্পকে একটি পাত্রে ধরে ঠাণ্ডা করলে জল ফিরে পাওয়া যাবে আর চিনি সরবতের গেলাসের তলায় পড়ে থাকবে।

ডালটন সাহেবের নিয়ম

প্রাচীন ভারতের মুনি ঋষিরা হাজার হাজার বছর আগে বিশ্বাস করতেন যে বাড়ি যেমন ইঁটের তৈরি তেমনি পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস অণু দিয়ে গঠিত। প্রাচীন গ্রীসের মনীষীদেরও এই বিশ্বাস ছিল। পৃথিবীতে অণুর প্রথম কল্পনা করেন কণাদ নামে ভারতের একজন ঋষি। সে আর এক গল্প।

প্রায় একশ বছরেরও বেশি আগে ইংলণ্ডে জন ডালটন নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। অণু পরমাণু সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি নিয়ম তৈরি করেন। সে নিয়মগুলি বিজ্ঞানের ছাত্রদের আজও মুখস্থ করতে হয়। নিয়মগুলি মোটামুটি হল এই :—

চোখে দেখা যায় না এমন সব খুব ছোট ছোট কণিকা দ্বারা সমস্ত মৌলিক পদার্থ গঠিত। এই কণিকাদের নাম পরমাণু বা অ্যাটম।

একই মৌলিক পদার্থের সমস্ত পরমাণু একই রকম। তার মানে সমস্ত লোহার পরমাণু একই রকম, তার সঙ্গে সোনার পরমাণুর কোনো মিল নেই।

এক এক জাতের পরমাণুর আলাদা আলাদা ওজন আছে, তাদের আবার নিজের নিজের গুণ আছে।

পরমাণু বা অ্যাটমকে ভাঙা যায় না। নতুন অ্যাটম তৈরি করাও যায় না।

অ্যাটমকে ভাঙা যায় না এই ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজি ১৯১৯ সালে রাদারফোর্ড নামে একজন বিজ্ঞানী নাইট্রজেনের একটি অ্যাটমকে ভেঙে প্রমাণ করেন যে অ্যাটমকে ভাঙা যায়। তাঁর আবিষ্কারের ফলে অ্যাটমের গঠন সম্বন্ধে পুরনো ধারণা বদলে গেল। কত নতুন নতুন আবিষ্কার হল। আজকাল ত অ্যাটম ভাঙবার যন্ত্রই তৈরি হয়েছে।

সবচেয়ে সরল হল হাইড্রজেন অ্যাটম। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে অত ছোট হাইড্রজেন অ্যাটমের একটি কেন্দ্র আছে। কেন্দ্রের নাম দেওয়া হল প্রোটন। প্রোটন একটা সাদামাটা কেন্দ্র নয়, তাতে পজিটিভ বিদ্যুৎ আছে। সেই প্রোটনের চারদিকে ঘুরছে ইলেকট্রন। ইলেকট্রনে আছে নেগেটিভ বিদ্যুৎ। ব্যাপারটা যেন সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে।

এক এক রকমের মৌলিক পদার্থের অ্যাটমের গঠন এক এক রকম।

আইনস্টাইন

জার্মানির উলম্ শহরে ১৮৭৯ সালে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়র। আইনস্টাইনের বয়স যখন মাত্র এক বছর তখন তাঁর বাবা মিউনিকে যান। তিনি সেইখানেই স্কুলে পড়তেন। লেখাপড়ায় তিনি খুব ভাল ছাত্র ছিলেন না আর জার্মান স্কুলের কড়া শাসন তাঁর মনঃপুত হত না।



তবে তাঁর মনের গড়ন একটু অন্য রকম ছিল, আর পাঁচজন ছেলের মতো নয়। ছোট বেলায় তাঁর বাবা তাঁকে একটা কম্পাস দিয়েছিলেন। কম্পাসটা যেদিকেই ঘোরানো যাক না কেন তার কাঁটাটা সব সময়ে উত্তর দিকে মুখ করে থাকে। কম্পাসটি পেয়ে আইনস্টাইনের ভারী মজা লাগল। সেই সময় তিনি একখানা ইউক্লিডের জ্যামিতি বই যোগাড় করেন। ক্লাসে পড়ানোর আগেই তিনি সমস্ত বইখানা নিজেই শেষ করে ফেলেন, সেই সঙ্গে অনেক কঠিন অঙ্কও তিনি শিখে ফেলেন। অঙ্কে তাঁর যেমন মাথা খেলত অমন আর কিছুতে নয়।

সেই অল্প বয়সেই আইনস্টাইনের গান খুব ভাল লাগত। তাঁর মা যখন পিয়ানোতে জার্মানির মস্ত বড় সুরকার বিটফেনের

সুর তুলতেন, আইনস্টাইনের চোখে জল টল্‌টল্‌ করত। তিনি নিজেও খুব ভাল বেহালা বাজাতে পারতেন।

তাঁর বয়স যখন ১৫ তখন তাঁর বাবা ইটালিতে মিলান শহরে চলে যান। তাঁর বাবার ইচ্ছে ছিল যে তাঁর ছেলেও তাঁরই মতো ইঞ্জিনিয়ার হবে, কিন্তু আইনস্টাইন তখন নিউটন, গ্যালিলিও আর ইউক্লিডের মধ্যে ডুবে গেছেন। তাঁর বাবা আইনস্টাইনকে ইঞ্জিনিয়ার করতে আর চেষ্টা করেননি।

পড়াশোনার আগ্রহ দেখে তিনি আইনস্টাইনকে সুইট্‌জার-ল্যাণ্ডের জুরিখ শহরে পলিটেকনিক অ্যাকাডেমিতে পড়তে পাঠালেন কিন্তু বিদেশী ভাষায় ভাল জ্ঞান না থাকায় তিনি প্রথমে ভর্তি হতে পারেননি। অঙ্ক আর পদার্থবিদ্যা তিনি খুব ভাল করে শিখলেন।

পড়াশোনা শেষ হল কিন্তু তিনি ইহুদি বলে কোনো স্কুল কলেজে চাকরী পান না। তখন তাঁর এক বন্ধু বার্ণ শহরে সরকারী পেটেণ্ট অফিসে পেটেণ্ট পরীক্ষা করবার একটি চাকরি জুটিয়ে দিলেন। চাকরির ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় আর কঠিন সব অঙ্ক কষতেন।

আইনস্টাইন যে জন্মে বিখ্যাত, সেই "থিওরি অভ রিলেটিভিটি" বা আপেক্ষিকতাবাদ তিনি প্রথম প্রকাশ করেন ১৯০৫ সালে, যখন তাঁর বয়স ২৬। তিনি যা বলেছেন তা আমাদের পক্ষে বোঝা ত অসম্ভব, পৃথিবীর খুব কম লোকেই তা বোঝে। তবে তিনি নতুন কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে পদার্থ আর শক্তি এক। একখণ্ড পাথরে বা ইঁটে লুকিয়ে আছে প্রচুর শক্তি। তাঁর তথ্যের ওপর নির্ভর করে অ্যাটম বোমা তৈরি হয়েছে এবং নতুন অ্যাটম যুগের আরম্ভ হয়েছে।

অতি ক্ষুদ্র অ্যাটমের মধ্যে যে বিপুল শক্তি লুকিয়ে আছে তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা চলছে। কিছু কিছু কাজ শুরু হয়েছে। তিনি যে সব নতুন নতুন তথ্য তাঁর বইয়ে লিখেছিলেন তার অনেকগুলিই প্রমাণিত হয়েছে।

সেই কবে জন্মেছিলেন গ্যালিলিও আর নিউটন আর তিনশ' বছর পরে এই দুজনের সমতুল্য আর একজন বিজ্ঞানী জন্মালেন, তিনি আইনস্টাইন। ভাবতে ভারী মজা লাগে যে আমাদের সময়েই আর একজন নিউটন জন্মেছিলেন।

আইনস্টাইন হিসেব করে বললেন যে দূরের কোনো নক্ষত্র থেকে কোনো আলোর রশ্মি সূর্যের খুব কাছ দিয়ে পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় তবে সূর্যের আকর্ষণের জন্যে ঐ রশ্মি একটু বেঁকবে। কতখানি বেঁকে যাবে তাও তিনি অঙ্ক কষে বার করে রাখলেন। কিন্তু সূর্যের আলো খুব প্রখর, নক্ষত্রের কোনো আলো পৌঁছচ্ছে কিনা ধরা যায় না। কিন্তু ধরা গেল ১৯১৯ সালের ১৯শে মে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়। আইনস্টাইন যা বলেছিলেন নিখুঁতভাবে তা মিলে গেল। আইনস্টাইনের জয়জয়কার পড়ে গেল।

১৯২১ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল। এতে অবশ্য নোবেল পুরস্কারেরই মান বাড়ল।

যশ আর অর্থ, দুটোকেই তিনি ঘৃণা করতেন। তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়স হবার সময় তাঁর দেশবাসীরা পটসডামে তাঁর একখানি মূর্তি স্থাপন করল, তাঁকে নানা সম্মানে সম্মানিত করা হল, চাঁদা তুলে একখানি বাড়িও তাঁকে দেওয়া হল। আবার হিটলারের আমলে ঐ দেশবাসীরাই তাঁর সমস্ত যন্ত্রপাতি, বইপত্তর ভেঙে পুড়িয়ে ছাই করে দিল। তিনি অতি কষ্টে কিছু বই আর

নিজের শখের বেহালাটি নিয়ে বেলজিয়ামে পৌঁছলেন, তারপর সেখান থেকে আমেরিকায়। আমেরিকায় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করতেন।

আইনস্টাইন ছিলেন একেবারে মাটির মানুষ, শিশুর মতো সরল, অহঙ্কার একটুও ছিল না। যুদ্ধকে ভীষণ ঘৃণা করতেন।

আইনস্টাইন সম্বন্ধে অনেক মজার মজার গল্প শোনা যায়। তিনি প্রিন্সটনে যে বাংলোয় থাকতেন তারই কাছাকাছি বাড়ির একটি ছোট মেয়েকে দেখা গেল যে সে আইনস্টাইনের বাড়ির দরজার সিঁড়িতে বসে তাঁর সঙ্গে লজেন্স চুষতে চুষতে খুব গল্প করছে। মেয়েটির মা খবর পেয়ে খুবই অপ্রস্তুত হলেন, কি অসভ্য মেয়ে, অতবড় একজন লোককে বিরক্ত করছে! তিনি ছুটলেন মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে। মা ত রীতিমত ভয় পেয়েছেন, তবুও সাহস করে বললেন, "প্রফেসর, আপনি ওর সঙ্গে কি গল্প করছেন?" একগাল হেসে আইনস্টাইন জবাব দিলেন, "এমন কিছু নয়, ও আমাকে লজেন্স খাওয়ায়, তার বদলে আমি ওর অঙ্ক কষে দি।"

বেলজিয়মের রাণী একবার আইনস্টাইনকে তাঁর প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু ষ্টেসনে যে তাঁর জন্য মস্তবড় মোটর-গাড়ি থাকবে আর অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যরা তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে ষ্টেসনে আসবে এসব তিনি ভাবতেই পারেন নি। তিনি ট্রেণ থেকে নেমে এক হাতে সুটকেশ আর অপর হাতে বেহালার বাক্সটি নিয়ে সকলের অগোচরে রাণীর প্রাসাদের দিকে হেঁটেই রওনা হয়েছেন। এদিকে আইনস্টাইনকে দেখতে না পেয়ে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ ফিরে এসেছেন। সকলে মনে করলেন যে আইনস্টাইন বুঝি আসতে ভুলে গেছেন কিন্তু এমন

সময় দেখা গেল যে দুই হাতে দুই বাক্স নিয়ে ধূলিমলিন বেশে আইনস্টাইন ফটক দিয়ে ঢুকছেন।

তাঁকে দেখতে পেয়ে রাণী এবং আর সকলে ছুটে গেলেন, আইনস্টাইন যেন মহা অপ্রস্তুতে পড়ে গেলেন। "এ কি ষ্টেসনে আপনি গাড়ি দেখতে পাননি ?" রাণী জিজ্ঞাসা করলেন। মুখ কাঁচুমাচু করে আইনস্টাইন বললেন, "কৈ না তো ? তাতে কি হয়েছে, আমি হাঁটতে বেশ ভালবাসি।"

১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল আইনস্টাইন মারা যান।

গাছ পালার গল্প

গাছ বললেই আমাদের বড় বড় গাছের কথা মনে পড়ে, বট, অশত্থ, আম, জাম, কাঁটাল, তাল, নারিকেল এইসব। গাছ আছে বহু রকমের। কত রকমের ? যাঁরা গাছ নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা হিসেব করে বলেছেন যে সারা পৃথিবীতে প্রায় আড়াই লক্ষ রকমের আলাদা আলাদা গাছ আছে।

সমস্ত গাছকে দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যাদের ফুল হয় আর যাদের ফুল হয় না। বেশির ভাগ গাছেরই ফুল হয়। অনেক গাছ আছে যাদের ফুল হয় কিন্তু দেখা যায় না, যেমন ডুমুর গাছের ফুল। আমরা কারও অনেক দিন দেখা না পেলে ঠাট্টা করে তাকে বলি "ডুমুরের ফুল"। আমরা ডুমুর বলে যেটি খাই তার মধ্যেই ডুমুরের ফুল থাকে। বাঁশ গাছের ফুল অনেক বছর অন্তর অন্তর হয়। ইন্দোনেশীয়ার মধ্যে জাভা, বোর্ণিও ও সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফুল পাওয়া যায়। এই ফুলের নাম র‍্যাফলেশিয় আরনলডাই। বলতে গেলে এর গাছ

বলতে কিছু নেই, মাটির ওপর ফুল ফুটে থাকে। এই ফুলের গন্ধ কিন্তু মোটেই ভাল নয়। এর এক একটি পাপড়ি এত বড় যে একটি ছোট ছেলেকে বেশ শুইয়ে রাখা যায়।

বাহার করবার জন্যে বাগানে যে সব নানারকমের ফার্ণ গাছ লাগানো হয় তাদের ফুল হয় না। পুকুরে কত রকমের পানা হয় তাদেরও ফুল হয় না। ব্যাঙের যে সাদা সাদা ছাতা বা শ্যাওলা দেখা যায়, এগুলিও গাছ কিন্তু এদেরও ফুল হয় না। আবার কোনো কোনো গাছ আছে শুধু একটা সরু লতার মতো, ফল ফুল পাতা কিছুই হয় না, এমন কি শেকড়ও নয়। কোনো কোনো গাছের ডাল আছে, শিকড় আছে কিন্তু পাতা বা ফুল হয় না।

মানুষের যেমন হাত পা ধড় মাথা থাকে, গাছেরও তেমনি শেকড়, গুঁড়ি, ডাল, পাতা আছে। গাছের শেকড় মাটি ছেড়ে ওপরের দিকে বাড়ে না, গুঁড়িও ওপর ছেড়ে মাটিতে নামে না। শেকড় নীচের দিকে বাড়ে বলে, গাছ শক্ত হয়ে মাটির ওপর দাঁড়াতে পারে, আর গুঁড়ি ওঁপর দিকে বাড়ে বলেই তারা লম্বা হয়ে ডাল পাতাগুলিকে ছড়িয়ে দিয়ে রোদে বাতাসে মেলে রাখতে পারে।

সবচেয়ে ছোট যে গাছ তাদের জন্মস্থান হল বিশাল সমুদ্র। এদের নাম ডায়াটম, আর একরকম আছে, তাদের নাম ডেসমিড। খালি চোখে এদের দেখা যায় না। এক ফোঁটা জলে কয়েকশত ডায়াটম বা ডেসমিড থাকতে পারে। এরা এত ধীরে ধীরে নড়াচড়া করে যে এরা বেঁচে আছে কিনা বোঝা যায় না। এদের দেখতে বেশ সুন্দর। এরা নিশ্বাস নেয়, খায়, আবার নিজেদের মতো আরও ডায়াটম তৈরী করতে পারে। অনেক বিজ্ঞানী

ডায়াটমদের গাছের দলে রাখতে চান না, তাঁরা বলেন এরা প্রাণী। এই নিয়ে এখনও আলোচনা হয়। অত ছোট জিনিসকে নিয়ে কত তর্ক অথচ সে নিজে কিছু জানে না।

এক রকম ঘাস আছে যে ঘাস এক মরশুমে ডালপালা সমেত সাড়ে চুরাশি হাজারটি পৃথক পৃথক শেকড় ছড়ায়। তাহলে ভেবে দেখ একটা পুরণো বট কি অশত্থ গাছ তার সারা জীবনে কত লক্ষ শেকড় ছড়ায়।

মাটি থেকে শেকড়ের সাহায্যে গাছ বাঁচবার জন্যে রস সংগ্রহ করে। শেকড় আর তার শত শত যে সব শাখা শেকড় আছে, তাদের গায়ে থাকে লক্ষ লক্ষ মূল রোম। ব্লটিং কাগজ যেমন ভাবে কালি শুষে নেয়, এই সব মূলরোম ঠিক সেইভাবে মাটি থেকে রস টেনে নেয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে যখন মাটিতে রস থাকে না, তখন অনেক দূরের গাছের শেকড় মাটির তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে পাতকুয়ো বা পুকুরের দিকে ছুটে চলে। চার-পাঁচ শত হাত কি তারও অনেক দূর থেকে বট গাছের অনেক শেকড় এসে কুয়ো ভেঙে দেয়।

মানুষ যেমন তার খাবারের সঙ্গে লোহা, গন্ধক, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি খায় গাছেরও সেইরকম এইসব খাবার দরকার হয়। শুধু জল খেয়ে সে বাঁচতে পারে না। মাটির ভেতরে শেকড় চালিয়ে সেও লোহা, গন্ধক, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং আরও অনেক কিছু দরকারী ধাতু সে টেনে নেয়।

নাইট্রজেন গাছের বিশেষ দরকার। বাতাসে প্রচুর নাইট্রজেন আছে। গাছ বাতাস থেকে নাইট্রজেন নেয় না। সে নাইট্রজেন নেয় মাটি থেকে। ধঞ্চে, মটর, সীম, চীনাবাদাম,

অপরাজিতা গাছের শুঁটি হয়। এই সব শুঁটিওয়ালা গাছ যেখানে হয় সেখানে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রজেন থাকে। এই সব গাছের শেকড় খুব ছোট, এত ছোট যে খালি চোখে দেখা যায় না, এমন সব জীবাণু দলে দলে বাসা বাঁধে। এই জীবাণুরা বাতাসের নাইট্রজেন টেনে নিয়ে গাছকে যোগায়। নাইট্রজেন গাছের একটি খুব ভাল সার। সেইজন্যে আমাদের দেশের কৃষকেরা কোন বড় একটা চাষ করবার আগে ক্ষেতে একবার ধঞ্চের চাষ দিয়ে নেয়।

গাছের পাতা হল গাছের রান্নাঘর। গাছের পাতা বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস টেনে নেয়। তা থেকে কার্বনটা রেখে দিয়ে অক্সিজেনটা বাতাসে ছেড়ে দেয়। ওদিকে শেকড় যে সব রস টানে সেগুলি পৌঁছে যায় পাতায়। পাতায় থাকে ক্লোরোফিল বা পত্রহরিৎ নামে এক বস্তু। ক্লোরোফিলের জন্যেই পাতার রং সবুজ। ওদিকে কার্বন পাতায় বাস আছে। যে সব রস পাতায় পৌঁছলো, গাছ সেই রসকে সূর্যের আলো, কার্বন আর ক্লোরোফিলের সাহায্যে নিজের খাবার তৈরি করে। এই আশ্চর্য উপায়ে খাবার তৈরির কৌশলটা মানুষ নকল করবার চেষ্টায় আছে, যদি পারে তাহলে খাবার যোগাড় করার হাঙ্গামা অনেক বেঁচে যাবে।

মানুষ আর কত দিন বাঁচে, সত্তর, আশি কি নব্বুই বছর তাও কত চেষ্টা করে। গাছ পড়ে আছে মাঠে বা জঙ্গলে, অযত্নে, অবহেলায়। তবুও তারা কতদিন বাঁচে কে বলতে পারে। আমেরিকার বনে হাজার দু হাজার বছরের পুরণো লম্বা লম্বা রেডউড গাছ এখনও বেঁচে আছে। মেক্সিকোতে ওকসাকা শহরের কাছে এক সাইপ্রেস গাছ আছে। তার

গুঁড়িটি এত মোটা যে তার বেড়ের নাগাল পেতে হলে অন্ততঃ চব্বিশ জন লোককে বেশ করে হাত বাড়িয়ে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে দাঁড়াতে হবে। গাছটির বয়স নাকি দশ হাজার বছর! শিবপুরে বটানিকাল গার্ডেনের বিশাল বটগাছটি কয়েক শ বছরের বৃদ্ধ।

মানুষ বা জীবজন্তুকে আঘাত করলে তারা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয়, গাছ তা পারে না, কিন্তু লজ্জাবতী লতা, ভুঁই-আমলা, বন চাঁড়াল, কামরাঙা প্রভৃতি গাছকে ছুঁলে বা আঘাত করলে এরা জানিয়ে দেয় যে তাদের লেগেছে।

জগদীশচন্দ্র বসু

প্রাচীন ভারতবর্ষে অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী জন্মেছিলেন, যেমন কণাদ, নাগার্জুন, সুশ্রুত, ভাস্করাচার্য, আর্যভট্ট, লীলাবতী এবং আরও অনেকে। এঁরা অনেকরকম নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করে গেছেন যার মধ্যে অনেকগুলি অনেক পরে ইয়োরোপের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে বিখ্যাত হয়েছেন। ভারতের বিজ্ঞানীরা যেসব তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলি তাঁরা মুখে বলে বা পুঁথিতে লিখেই ক্ষান্ত ছিলেন না, প্রত্যেকটি তথ্যের সঙ্গে তাঁরা প্রমাণ দিয়ে গেছেন।

এখন থেকে সাতশ' আটাশ' বছর আগে পর্যন্তও ভারতে বিজ্ঞানচর্চা যথেষ্ট ছিল কিন্তু তারপর থেকে বিদেশীরা বার বার ভারত আক্রমণ করতে লাগল, দেশের শান্তি নষ্ট হল, তারপর মুসলমান রাজত্ব চলল, তারপর ইংরেজ রাজত্ব। ভারতে এই

দীর্ঘদিন বিজ্ঞান চর্চা বন্ধ ছিল। এই সময়ে ভারতে কোনো বিজ্ঞানীর নাম শোনা যায় নি।

তারপর অনেকদিন পরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর আবিষ্কারের দ্বারা ভারতের হারাণো গৌরব ফিরিয়ে আনলেন, এ যুগে তিনি প্রমাণ করলেন যে ভারতবাসীরা বিজ্ঞান চর্চায় কারও চেয়ে কম নয়। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার থেকে প্রেরণা পেয়ে তারপর সারা দেশে কত বড় বড় বিজ্ঞানী জন্মালেন।



আচার্য জগদীশচন্দ্র ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা বাবা ভগবানচন্দ্র বসু তখন সেখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

ভগবানচন্দ্র কড়া শাসক ছিলেন কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ ছিল কোমল। একবার তিনি এক ডাকাত সর্দারকে জেল দিয়েছিলেন। সেই ডাকাত সর্দার জেল থেকে বেরিয়ে এসে ভগবানচন্দ্রকে বললেন, "এখন আমি কী করে খাব, কেউ

আমাকে চাকরী দেবে না"। ভগবানচন্দ্র তাকে ভার দিলেন বালক জগদীশচন্দ্রকে স্কুলে নিয়ে যেতে আর ফিরিয়ে আনতে। জগদীশচন্দ্র তার কাঁধে চেপে স্কুল যেতেন।

জগদীশচন্দ্রের বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁকে একটি টাট্টু ঘোড়া কিনে দেওয়া হয়েছিল। তিনি বেশ মজা করে খট্ খট্ করে টাট্টু ঘোড়ায় চেপে বেড়াতেন। একবার ফরিদপুরে ঘোড়দৌড় হচ্ছে, টাট্টু চেপে জগদীশচন্দ্রও ঘোড়দৌড় দেখতে গেছেন। কেউ হয়ত মজা করবার জন্যে তাঁকেও ঘোড়দৌড়ে যোগ দিতে বলেছিল। জগদীশচন্দ্রও মহা উৎসাহে ঘোড়দৌড়ে যোগ দিলেন। তিনি যদিও সব শেষে এলেন কিন্তু দৌড় শেষ করতে পারায় তাঁর যে আনন্দ হল তাতে মনে হল তিনিই যেন দৌড়ে প্রথম হয়েছেন। কিন্তু সেই দৌড়ের সময় তাঁর হাত পা ছড়ে গিয়েছিল সে কথা কাউকে বলেন নি।

তারপর ক্রমে জগদীশচন্দ্র সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি, এ পাশ করলেন। তখন সেই কলেজে ফাদার লাফোঁ ফিজিক্স পড়াতেন। ভাল বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক হিসেবে ফাদার লাফোঁর খুব নাম ছিল। জগদীশচন্দ্র ছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্র।

অনেক পরে জগদীশচন্দ্র যখন বেতার তরঙ্গ আবিষ্কার করেন এবং এই আবিষ্কার যে তিনি মার্কনি সাহেবের আগে করেছেন, ফাদার লাফোঁ তা প্রমাণ করেন।

বি, এ পাশ করার পর জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছা হয় যে তিনি বিলেতে যেয়ে আই, সি, এস পরীক্ষা দেবেন। কিন্তু তার বাবা বলেন যে "তুমি বিলেতে যেয়ে আরও বেশি লেখাপড়া শিখে এস কিন্তু আই, সি, এস পরীক্ষা তোমাকে দিতে হবে না।"

জগদীশচন্দ্র বাবার আদেশ মাথায় নিয়ে বিলেত যাত্রা করলেন। তখন তাঁর মাঝে মাঝে জ্বর হত। বিলেতে যেয়েও জ্বর বন্ধ হল না কিন্তু সেখানে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেন। ডাক্তারী পড়তে হলে খাটুনি অনেক বেশি। দুর্বল শরীরে অত খাটুনি সহ্য করতে পারলেন না। ডাক্তারী পড়া ছাড়তে হল। তখন তিনি কেম্‌ব্রিজে পড়তে গেলেন। কেম্‌ব্রিজে তিনি নিয়মিত দাঁড় টানতেন, তাতে স্বাস্থ্য ভাল হল, জ্বর বন্ধ হল। কেম্‌ব্রিজে তিনি তিন বছর থাকলেন, সেখানকার বিজ্ঞানের (ট্রাইপস) পরীক্ষা পাশ করলেন। তারপর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এসসি পরীক্ষায় পাশ করে দেশে ফিরলেন। দেশে ফিরে তিনি যে সব গবেষণা করতেন তারই কিছু লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি, এস্‌সি অর্থাৎ ডক্টর অফ সায়েন্স উপাধি দিয়েছিলেন।

দেশে ফিরে জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিজিক্সের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। তখন ইংরাজ অধ্যাপক অপেক্ষা ভারতীয় অধ্যাপকদের অনেক কম মাইনে দেওয়া হত। জগদীশচন্দ্র এই অপমানজনক ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন। তাঁরই চেষ্টায় এই ব্যবস্থা বদলে গেল, মাইনে সকলের সমান হল।

প্রেসিডেন্সি কলেজেই পড়াবার সময় তিনি বেতার-তরঙ্গ আবিষ্কার করেন। এক পরীক্ষায় একদিন দেখিয়েও দিলেন, বিনাতারের বিদ্যুতের ঢেউ এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেয়ে পিস্তল ছুঁড়ল। পৃথিবীতে এই প্রথম বিনা তারে বার্তা প্রেরণ হল। পরে অবশ্য মার্কনি সাহেব এর বহু উন্নতি করেছেন।

বেতার তরঙ্গ আবিষ্কারের পর জগদীশচন্দ্র অন্যরকম গবেষণায় মন দিলেন। তিনি দেখালেন যে মানুষকে চিমটি

কাটলে মানুষ যেমন জানতে পারে আর বুঝিয়েও দেয় তেমনি জড় পদার্থ মানে যাদের প্রাণ নেই, তারা, গাছপালা এবং মানুষ আঘাত পেলে একই রকম সাড়া দেয়। জগদীশচন্দ্র একরকম যন্ত্র তৈরি করলেন, তিনি সেই যন্ত্রে জড় পদার্থ, গাছ আর মানুষকে আঘাত করে তারা যে সাড়া দিয়ে আঘাত জানিয়ে দিল, সেই আঘাতের সাড়া তুলে নিলেন। সেই সাড়ার ছবি দেখে ধরা কঠিন কোন সাড়া পাথরের, কোন সাড়া গাছের আর কোনটি মানুষের।

তিনি ক্রেস্কোগ্রাফ নামে এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। তাঁর সেই যন্ত্রে এইসব সাড়া আপনা আপনি ধরা পড়ে। গাছকে খাবার দেওয়া হল, তাকে বিষ দেওয়া হল, চিমটি কাটা হল এবং এতে গাছ কি করছে তার সবকিছু চোখের সামনে দেখা যেতে লাগল ঐ যন্ত্রে।

১৯১৫ সালে তিনি 'সার' উপাধিতে ভূষিত হন আর ১৯২০ সালে লণ্ডনে রয়েল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন। তাঁর আবিষ্কার বিদেশে বিজ্ঞানীদের বোঝাবার জন্যে তিনি পাঁচবার বিলেত ও অন্য অন্য দেশে গিয়েছিলেন।

১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন আর ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর গিরিডিতে তিনি মারা যান।

পশুপাখির বাচ্চা

মানুষ ছাড়া আর সব প্রাণীকে ইতর প্রাণী বলা হয়। ইতর প্রাণীরা সাধারণতঃ তাদের বাচ্চাদের যত্ন নেয় না। তাতে কি? তাদের বাচ্চারা মানুষের বাচ্চার চেয়ে অনেক শক্ত হয় আর অনেক তাড়াতাড়ি বড় হয়। গরুর বাছুর আর হরিণের ছানা মায়ের পেট থেকে পড়েই লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি করে। তাইত কথায় আছে ঃ—

মানুষের বাছা ছ' মাস পচা
গরুর বাছা তুলে নাচা।

বাছুর কিংবা হরিণছানা পেট থেকে পড়েই দৌড়তে পারলেও সিংহ আর ভাল্লুকের বাচ্চা চোখে দেখতে পায় না, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখ ফোটে না। নারীর গর্ভ পূর্ণ হতে সময় লাগে ন' মাসের কিছু বেশি দিন। হাতীর লাগে একুশ মাস আর ইঁদুরের মাত্র একুশ দিন। সমুদ্রের একটি সীলের ওজন যদি হয় একশ' পাউণ্ড তাহলে তার বাচ্চার ওজন হবে কুড়ি পাউণ্ড। ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা খুবই ছোট হয়, নেংটি ইঁদুরের মতো। চিড়িয়াখানায় ক্যাঙ্গারু দেখেছ নিশ্চয়, অতবড় জানোয়ারের কতটুকু ছানা। হিসেব নিয়ে দেখা গেছে যে মায়ের যা ওজন হয় তার তিন হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র হয় ক্যাঙ্গারুর বাচ্চার ওজন।

ছোট ছোট গিনি পিগ সকলেই দেখেছে। গিনি পিগের মতো আর একরকম জন্তু আফ্রিকায় আছে। তাদের নাম হাইর‍্যাক্স। হাইর‍্যাক্সের বাচ্চারা সাত দিন বয়স হতে না হতেই

তাদের বাবা মায়ের মতো বড় হয়ে যায়। সে তার মায়ের সঙ্গে কাজ করে বেড়ায়, ভয় পেলে মায়ের সঙ্গেই লাফ দিয়ে গর্তে কিংবা গাছের কোটরে লুকোয়।

বানর, হনুমান, গোরিলা, ওরাং ওটাং আর শিম্পাঞ্জিদের সঙ্গে মানুষের কিছু মিল আছে। এরা মানুষের চেয়ে কম সময়ে বাচ্চা প্রসব করে। এদের বাচ্চারা আট ন' বছর বয়সেই বাপমার মতো বড় হয়ে ওঠে।

যে সব জন্তুদের খুর আছে তাদের বাচ্চাগুলি বেশ শক্ত হয়ে জন্মায়। এরা গাছপাতা নিরামিষ খায় কিন্তু যে সব জন্তু মাংস খায় নয়ত ভাল ভাল জিনিস খায় তাদের বাচ্চারা কত অসহায় হয়ে জন্মায়। একটা বড় ভাল্লুক যার ওজন তিনশ' পাউণ্ড তার ছোট ছোট মুরগির বাচ্চার মতো তিন চারটি বাচ্চা এক সঙ্গে হয় কিন্তু সব কটা অন্ধ। গায়ে লোম না থাকলে ভাল্লুকের বাচ্চা বলে মনেই হয় না।

হাতীর একটি বাচ্চার ওজন হয় একজন বড় মানুষের সমান বা তার চেয়েও বেশি ভারি হয়। হাতীর বাচ্চা তিন চার বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ খায়। বেশ শক্ত সমর্থ হতে পনেরো থেকে আঠারো বছর সময় নেয়।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জন্তু হল তিমি মাছ। তিমির সমান বড় জন্তু আর কিছু নেই, ছিলও না। একটা তিমির ওজন যদি হয় বারো শ' মণ তাহলে তার বাচ্চার ওজন হবে দুশ' মণ।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে বাদুড়ই একমাত্র জীব যে উড়তে পারে। বাদুড় তার ছানাদের খুব যত্ন করে। বাচ্চার একটু কষ্ট হলেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মা-বাদুড় খুব যত্ন নিয়ে বাচ্চাকে উড়তে শেখায়, তার সব সময়ে ভয় এই বুঝি বাচ্চা পড়ে গেল, গাছের

ডালে বুঝি তার কচি ডানা আটকে গেল। রক্তচোষা বাদুড় কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার দৈত্য-বাদুড়েরাও তাদের বাচ্চাদের মোটেই অবহেলা করে না। বাদুড়ের ছানারা পাঁচ মাসের মধ্যেই বেশ বড় হয়ে ওঠে, তখন তাদের দু' দিকের ডানা টেনে ধরে মাপলে দু ফুট হবে। কোনো কোনো জাতের বাদুড়ের দুটো থেকে চারটে ছানা হয়, ওড়বার সময় সব কটা ছানা মায়ের গা আঁকড়ে ধরে ঝুলতে থাকে। মা-বাদুড় সব কটা ছানা এক সঙ্গে নিয়ে বেশ উড়তে পারে।

অস্ট্রেলিয়ার কথা উঠলেই মনে পড়ে ক্রিকেটবীর ডন ব্র্যাডম্যানের নাম আর ক্যাঙ্গারু। ক্যাঙ্গারুরা তাদের লেজের ওপর ভর দিয়ে বেশ জোরে দৌড়তে আর লাফাতে পারে। এদের পেটে একটি থলি থাকে। সেই থলির মধ্যে তারা বাচ্চাদের রাখে। ক্যাঙ্গারুর মতো জন্তু যারা পেটের মধ্যে বাচ্চা রাখে যেমন অপোসাম, ওয়ালাবি; এদের বলে মার্সুপিয়াল। অপোসামের দশ বারোটি ক্ষুদে বাচ্চা একটি বড় হাতার মধ্যে বেশ রাখা যায়।

পোকা-মাকড়দের মধ্যে মাকড়সা তাদের বাচ্চাকে খুব যত্ন করে, এত যত্ন মানুষেও বোধহয় করে না। মাকড়সা তার ক্ষুদে ডিমগুলি একটি ছোট্ট সাদা-সিল্কের থলির মধ্যে রাখে। এমন চ্যাপ্টা সিল্কের থলি দেওয়ালের গায়ে দেখা যায়। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবার আগেই সে বাচ্চাদের জন্যে আলাদা আলাদা ছোট ছোট জাল বুনে রাখে। বাচ্চাদের বাঁচাবার জন্যে সে নিজের প্রাণ দেয় তবুও বাচ্চাদের ছাড়ে না। এক রকমের মাকড়সা আছে সে তার কয়েকশত বাচ্চাকে সব সময়ে পিঠে চড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়।

সাপ, গিরগিটি, টিকটিকি, যাদের সরীসৃপ বলি তাদের মধ্যে কেউ কেউ ডিম পাড়ে, কেউ কেউ বাচ্চা প্রসব করে। কুমীর ডিম পাড়বার আগে একটা বাসা তৈরি করে। ডিম পেড়ে বাসার মধ্যে রেখে দেয়। অনেক কুমীর গর্তের মধ্যে ডিম রেখে চাপা দিয়ে দেয়। দু' মাস পরে ডিম ফুটে বাচ্চা আপনিই বেরিয়ে আসে। ঐখানেই শেষ, কুমীর তার বাচ্চাদের খাবার যোগাড় করে দেয় না, নিজে চরে খেতে হয়। শুধু কুমীর কেন, গিরগিটি, সাপ, কচ্ছপ, এরাও বাচ্চার কোনো যত্ন নেয় না।

ঢোঁড়া সাপের এক সঙ্গে ষাট সত্তরটি বাচ্চা হয় তবে বিষওয়ালা সাপের একসঙ্গে অত বাচ্চা হয় না। হলেই ত আমাদের বিপদ আরও বাড়ত। এক চিড়িয়াখানায় একটা বিরাট বোয়া সাপ ছিল, লম্বায় আঠারো ফুট, ওজন ১৭৫ পাউণ্ড। সেই সাপ একবার এক সঙ্গে ৭২টা ছানা প্রসব করেছিল, প্রত্যেকটা এক গজ লম্বা আর দু' ইঞ্চি পুরু। এদের এত বাচ্চা বাঁচে না, বেশির ভাগই মরে যায়।

বরফের দেশ দক্ষিণ মেরু হল পেঙ্গুইনদের রাজ্য। পেঙ্গুইনরা এক কালে হয়ত পাখি ছিল, এখন আর তারা উড়তে পারে না। এরা ডিম পাড়ে, ডিম পাছে ঠাণ্ডায় জমে যায় সেজন্যে তারা ডিমটিকে সযত্নে পায়ের খাঁজে রেখে দেয় আর ডিমটিকে নিয়েই চলাফেরা করে। এখন ডিমটিকে নিয়ে চলাফেরা করবার সময় ডিমটি যদি পড়ে যায় কিংবা হারিয়ে যায় তাহলে সেটিকে যে পেঙ্গুইন কুড়িয়ে পাবে সে তাকে তুলে নিয়ে নিজের পায়ের খাঁজে রেখে দেবে। এইভাবে একটি ডিম অনেকবার পায়ের খাঁজ বদল হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরে গায়না দ্বীপে এক মজার পাখী আছে,

তাদের নামও বেশ মজার, টিনামু। টিনামু পাখী ডিম পেড়ে উড়ে কোথায় চলে যায় কে জানে! সেই ডিমে তখন তা দেয় পুরুষ পাখী, এক আধ দিন নয়, ৫৬ দিন ধরে। অনেক সময় এমনও হয় যে ডিম ফুটে সবে মাত্র বাচ্চা বেরিয়েছে, মা-পাখী তখনি আর একটা ডিম রেখে আবার কোথায় উড়ে গেল। তখন ভারী বিপদ হয় পুরুষ পাখীর। নতুন বাচ্চাটিকে পুষতে হয় আবার নতুন ডিমে তা দিতে হয়।

হর্ণবিল বা হাতুড়ে পাখী কি তোমরা দেখেছ? চিড়িয়াখানায় আছে। আসামে নাকি এই পাখী আছে। মা-পাখী ডিম পাড়লেই বাবা পাখী সেই ডিম আর মা-পাখীকে গাছের একটি কোটরে পুরে দেয়, তারপর কোটরের মুখটা কাদা দিয়ে বন্ধ করে দেয়, খাবার দেবার জন্যে ছোট্ট একটা গর্ত রাখে।

কোকিল বেশ মজা করে। সে কাকের বাসায় ডিম পেড়ে কোথায় সরে পড়ে। কাকই তার ডিমে তা দেয়, বাচ্চা হলে তাকে খাইয়ে-দাইয়ে বড় করে।

পোকামাকড়ের শক্তি

অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে মানুষ ভাবছে তার এখন কত জোর! অ্যাটমের মধ্যে যে শক্তি লুকিয়ে আছে, মানুষ ভাবছে তাকে আলাদিনের সেই কলসির দৈত্যের মতো খাটিয়ে নিয়ে অসাধ্য সাধন করবে।

সত্যি বলতে কি মানুষ যতখানি জোর গলায় তার নিজের জোর জাহির করছে তার কিন্তু অতখানি জোর মোটেই নেই।

তোমাদের আশে-পাশে বাড়ির আনাচে-কানাচে ঝোপেঝাড়ে

বাগানে পুকুরপাড়ে কত রকমের পিঁপড়ে আর পোকামাকড় রয়েছে তাদের যে কী ভীষণ জোর জানলে অবাক হতে হবে।

কত রকমের পোকা আছে যারা নিজে যতখানি লম্বা তার চেয়ে 'একশ' গুণ বেশি লংজাম্প করতে পারে কিংবা পাঁচশ' গুণ বেশি হাইজাম্প করতে পারে, নিজের ওজনের চেয়ে পাঁচশ' গুণ ভারী মাল বইতে পারে।

এরা ত মানুষের চেয়ে অনেক অনেক ছোট কিন্তু এত জোর তারা পায় কোথা থেকে? মানুষ তার এত বিদ্যাবুদ্ধি আর এত বড় বড় ল্যাবরেটরি নিয়ে এখনও এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক করতে পারেনি।

ঐ যে ক্ষুদে পোকাটা নিজের ওজনের চেয়ে পাঁচশ' গুণ ভারী মাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমায় যদি তার সমান মাল বইতে হয় তাহলে কত মাল বইতে হবে? কম্‌সে কম ৩৬ টন একা আর খালি হাতে। তবেই আমার জোর হবে ঐ ক্ষুদে পোকাটার সমান! আর ঐ যে আর একটা ক্ষুদে পোকা হাইজাম্প করছে? ওর সমান যদি হাইজাম্প করতে হয় তাহলে পর পর দশটা মনুমেণ্ট চাপিয়ে যতটা উঁচু হবে, অতটা উঁচু এক লম্ফে ক্লিয়ার করতে হবে।

এই সব ক্ষুদে পোকার অনেকেরই শরীরের গঠন এমন মজবুত যে তার নিজের শক্তির বেশি তারা খাটতে পারে। এক রকমের গোবরে পোকা আছে তার শরীরটা একটা বর্ম দিয়ে ঢাকা। বর্ম এমন কিছু পুরু নয়। এক ইঞ্চি পুরু কোনো মোটা পাতকে যদি একশ' ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে যতটুকু পাতলা হবে, সেই বর্ম ততটুকু পাতলা। তাই কি মজবুত। সেই গোবরে পোকা যখন ঘণ্টায় ২০ মাইল জোরে উড়তে উড়তে

দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে নীচে পড়ে যায় তখন তার যেন কিছুই লাগে না, সে তখুনি উঠেই আবার উড়তে শুরু করে। এই সঙ্গে তুমি বেশ করে ভেবে দেখ যে তুমি দৌড়ে এসে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলে, তক্ষুনি কি আর উঠেই দৌড়তে পারবে ?

লাল লাল যে সব কাঠপিঁপড়ে গাছের ডালে ডালে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় ওদের জোরই কি কিছু কম নাকি ? তারা মাটির নীচে শত শত গজ সরু সরু রাস্তা খুঁড়ে এক একটা শহর তৈরি করে। সেইখানে তারা তাদের বাসা বানায়। সেই বাসায় পাতা পচিয়ে তারা ছোট্ট ছোট্ট এক রকম পাতার চাষ করে। সেই পাতা তারা খায়।

বড় গাছের ডগায় যে সব কচি পাতা হয় তারা সেই পাতার টুকরো কেটে মুখে করে বাসায় নিয়ে আসে। এই যে বাসা থেকে গাছের ডগায় উঠে পাতার টুকরো কেটে নিয়ে আবার বাসায় ফিরে আসা, মানুষের হিসেবে একে আনলে হলে আটাশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠতে হবে আর সাড়ে আট মাইল রাস্তা হাঁটতে হবে। এই কাজ ঐ পিঁপড়েরা দিনে তিনবার পর্যন্ত করে। সেই সঙ্গে যে পাতার টুকরোটি বয়ে আনে সেটি তার নিজের ওজনের ডবল।

ছোটবেলায় পেয়ারা গাছে চড়ে পেয়ারা পাড়বার সময় নালসো পিঁপড়ের কামড় দু' চারবার খেয়েছেন নিশ্চয়। কী রকম জ্বলুনি বলুন ত ? নালসো পিঁপড়ে আর ডেঁয়ো পিঁপড়েরা গরু পোষে। গরু মানে কি আর আসল গরু ? তা নয়। ব্যাপারটা শুনুন।

বর্ষাকালে প্রদীপ বা আলোর চারদিকে এক রকম ছোট

ছোট সবুজ পোকা দেখা যায়। সময় সময় এই পোকা কালো রঙেরও হয়। কেউ কেউ এই পোকাকে জাব পোকা বলে। নালসো পিঁপড়েরা জাব পোকার ডিম বাসায় এনে অতি যত্নে সেই সব ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বার করে। এই জাব পোকাদের মধু হয়। পিঁপড়েরা সেই মধু খায়। এরাই হল পিঁপড়েদের গরু। যাতে এই 'গরু' পালাতে না পারে সেজন্যে পিঁপড়েরা জাল বুনে খোঁয়াড় তৈরি করে পোকাগুলিকে আটকে রাখে। অনেক সময় এই 'গরু' পিঁপড়ের মধ্যে লড়াই বাধে।

জিন হেনরি ফ্যাবার ফ্রান্স দেশের একজন নাম-করা বিজ্ঞানী ছিলেন। পোকামাকড় নিয়ে তিনি অনেক পরীক্ষা করেছেন। কতদিন মাঠের মাঝখানে তিনি উবুড় হয়ে চুপ করে শুয়ে শুয়ে পোকামাকড়দের গতিবিধি লক্ষ্য করতেন। একবার ত তাঁকে পুলিশে ধরেই নিয়ে গিয়েছিল। পুলিশের সন্দেহ হয়েছিল লোকটা অতক্ষণ বালির ওপর চুপ করে পড়ে রয়েছে, ও নিশ্চয়ই পুলিশের গুপ্তচর।

তিনি দেখেছিলেন যে বিছের ছানারা জন্মাবার পর ছ' সাতদিন পর্যন্ত কিছুই খায় না কিন্তু তাই বলে অলস হয়ে বসেও থাকে না, দিব্যি এদিক ওদিক বেশ ঘুরেফিরে বেড়ায়। মাকড়সার বাচ্চারা ত প্রথম দু' এক মাস কিছুই খায় না, তারা যেন বিছের ছানার চাইতেও বেশি চঞ্চল, অথচ এই সময়ের মধ্যে তারা আকারে বাড়ে অথচ ওজনে বাড়ে না। এ আবার এক মজার ব্যাপার। ফ্যাবার নিজে বা আর কেউ আজ পর্যন্ত এই ব্যাপারটার কোনো কূলকিনারা করতে পারেন নি।

ফ্যাবার কয়েকটা বড় বড় বিছেকে ধরে একটা কাঁচের জারের মধ্যে ন' মাস পর্যন্ত ভরে রেখেছিলেন, কিছুই খেতে

দেননি। জারের মধ্যে ছিল বিশুদ্ধ বালি আর মাঝে মাঝে হাওয়া বদলে টাটকা হাওয়া ভরে দেওয়া হত। এই ন' মাস বিছেগুলি তাদের নড়াচড়া বন্ধ করেনি।

উই-এর ঢিবি দেখেছ ত? এক একটা কত উঁচু হয়। পঁচিশ ফুট পর্যন্ত উই-ঢিবি দেখা গেছে। এক একটা উই-ঢিবি এক একটা শহর। ডিম রাখবার, বাচ্চা রাখবার, খাবার রাখবার, আলাদা আলাদা ঘর আছে এই সব ঢিবির মধ্যে। একটা উই পোকা আর কত উঁচু হবে কিন্তু সে তার তুলনায় কত হাজার গুণ উঁচু বাড়িই না তৈরি করে। আমরা কত যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে সবচেয়ে উঁচু যে বাড়ি তৈরি করেছি তা হল ১৪৭২ ফুট উঁচু।

সোঁদর বনের কেঁদো বাঘ

আমাদের বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকে বিশাল এক বন আছে। সে বনের নাম সুন্দর বন। সুন্দর বন নাম হলেও বনটি মোটেই সুন্দর নয়। তবে সুন্দর বন নাম কেন হল? এই বনে সুন্দরি বা সুঁদরি নামে এক রকম বড় বড় গাছ হয়। সেই গাছের নাম থেকেই এই বনের নাম হয়েছে সুন্দর বন।

সুন্দর বনে হরিণ, শূকর, গোখরো সাপ, কুমীর আর হাঙ্গর আছে। নানা রকমের পাখিও সুন্দরবনে পাওয়া যায়, যেমন নানা রকম হাঁস, বক, বুনো মুরগি, সারস, টিয়া, হরিয়াল এই সব। তবে যেজন্যে সুন্দরবনের এত নামডাক তা হল এর রয়েল বেঙ্গল টাইগারের জন্যে।

সুন্দরবনে আগে এক সিংওয়ালা এক রকম ছোট গণ্ডার

পাওয়া যেত আর এক রকম জলচর মহিষ পাওয়া যেত। দুঃখের বিষয় এ দুটি এখন আর সুন্দরবনে পাওয়া যায় না। শিকারীর গুলি খেতে খেতে ওরা শেষ হয়ে গেছে। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের একটা বিশেষ গুণ আছে যেটা পৃথিবীতে আর কোনো বাঘের নেই। সেটা হল এই যে সুন্দরবনের বাঘেরা পুরুষানুক্রমে মানুষখেকো। অথচ অন্য দেশের বাঘেরা বুড়ো হলে যখন আর বেশি দৌড়ঝাঁপ করতে পারে না তখনই মানুষ খায় কিংবা যদি কখনও একবার মানুষ খায় তখন থেকেই তারা মানুষ খেতে শেখে। বাঘের নাকি মানুষের মাংস খেতে খুব ভাল লাগে কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেই বাঘের ছেলেও বাঘ খাবে।

কিন্তু সুন্দরবনের প্রত্যেকটি বাঘ কি করে পুরুষানুক্রমে মানুষ খেতে শিখল? বাঘ অবশ্য এর কোনো ইতিহাস লিখে রাখেনি তবে অনুমান করে নিতে হয়। অনেক কাল আগে সুন্দরবন আরও নীচু ছিল, তখন ব-দ্বীপ তৈরি হচ্ছিল। পরে নদীর পলি পড়ে পড়ে জমি অনেক উঁচু হয়েছে। তা সেই কালে সমুদ্রের জোয়ার এলে বনের অনেক দূর জল ঢুকে পড়ত। জলের স্রোতে শূকর বা হরিণ ভেসে যেত, জলের কুমীর তাদের মজা করে খেত। বাঘের পায়ে নখ আছে। বাঘ সেই নখ দিয়ে আঁচড়ে গাছে উঠে নিজেদের কোনো রকমে বাঁচিয়ে রাখত। জলের স্রোত থেকে রক্ষা পেলেই ত আর প্রাণটা বাঁচবে না? পেটে খেতে হবে। জল সরে গেলে বাঘ খাবারের সন্ধানে গাছ থেকে নেমে আসত। খাবার খুঁজতে খুঁজতে কোনো গ্রামের কাছে এসে গরু ছাগল খেতে খেতে সাহস বেড়ে গেল। তারপর সে মানুষ খেতে আরম্ভ করল। বাঘ দেখল যে মানুষ ধরা অনেক

সহজ আর খেতেও ভাল। বড় বাঘের দেখে তাদের বাচ্চারাও মানুষ খেতে শিখল। সুন্দরবনের বাঘ সেই যে মানুষ খেতে শিখল তার সেই অভ্যাস আজও বজায় রয়েছে।

কাঠ কাটতে, মৌচাক ভেঙে মধু আনতে বা মাছ ধরতে যে সব মানুষ সুন্দরবনে যায়, বাঘ তার প্রত্যেকটি গতিবিধি নড়াচড়া ভাল করেই লক্ষ করে করে মানুষকে সে ভাল করেই চিনে ফেলেছে। ঠিক কোন্ সময় মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তা সে ভাল করেই জানে, তাই দেখা যায় যে মানুষ ঠিক একই অবস্থায়—যেমন তীরে উঠে এক কাছি খোলবার সময়, কি মাছ ধরতে ধরতে দূরে চলে যাওয়া কোনো একা মানুষ বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারায়।

সুন্দরবনে অজগর সাপ আর রাজগোখরো সাপও অনেক আছে। এরা সংখ্যায় আরও বেড়ে যেত যদি বড় বড় গিরগিটির মতো গোসাপ সাপেদের ডিম খেয়ে না ফেলত। গোসাপের চামড়া থেকে মেয়েদের হ্যাণ্ডব্যাগ, মেয়েদের জুতো তৈরি হয়, তাই অনেক লোক লুকিয়ে এই গোসাপ শিকার করে। সুন্দরবনে শিকার করতে হলে সরকারের অনুমতি নিতে হয়।

ইউরেকা! ইউরেকা!

সাধারণ মানুষের জীবনে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে, যেমন ট্রেনে ধাক্কা লেগে কারও হাত ভেঙে গেল। পড়ে গিয়ে কেউ পা ভাঙলেন। এই দুর্ঘটনার জন্যে তার জীবনে অনেক অদলবদল হতে পারে।

কলম্বাস তিনখানি জাহাজ নিয়ে বেরিয়েছিলেন ভারতবর্ষ

আবিষ্কার করতে; কিন্তু গিয়ে পৌঁছলেন আর এক দেশে, যে দেশের নাম আমেরিকা। এ হল আর এক ধরণের দুর্ঘটনা। আরও এক ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে যার ফলে অনেক বড় বড় আবিষ্কার ঘটেছে।

অনেক দিন আগে ইটালির বলোনা শহরে লুইজি গ্যালভানি নামে একজন অধ্যাপক তাঁর রুগ্না স্ত্রী লুসিয়ার জন্যে ব্যাং-এর ঝোল রান্না করবার ব্যবস্থা করছিলেন। সে সময় তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে মরা ব্যাং-এর পায়ে ছুরি অথবা কাঁটা লাগলেই মরা ব্যাং তার পা যেন টেনে নিচ্ছে। এ ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার! গ্যালভানি ছিলেন অধ্যাপক মানুষ, তিনি তখনকার দিনে শরীরের বিষয় পড়াতেন। ব্যাপারটা ভাল করে দেখতে হচ্ছে ত! এই মনে করে তিনি একটা মরা-ব্যাং-এর ছাল ছাড়িয়ে তাকে কোমর থেকে আধাআধি কেটে নিলেন তারপর নুন জলে ডুবিয়ে একটা লোহার রড থেকে তামার তার দিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন। ব্যাং-এর পা দুটোকে তিনি এমনভাবে ঝোলালেন যাতে সামান্য হাওয়াতেই পা দুটো দোলে আর সেই সঙ্গে আর একটা লোহার রডে পা দুটো যেন দুলতে দুলতে ঠেকে।

গ্যালভানি দেখলেন যে যতবারই ব্যাং-এর পা অপর লোহার রডে ঠেকে ততবারই হঠাৎ আগুনে ছ্যাঁকা লাগার মতো ব্যাং পা দুটো চট্ করে টেনে নিচ্ছে। লোহা তামা আর ব্যাং-এর ভিজে ঠ্যাং এই তিনে মিলে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হচ্ছিল যার জন্যে ব্যাং-এর পা হঠাৎ ঝাঁকুনি খাচ্ছিল!

এই খবর সারা ইটালিতে ছড়িয়ে পড়ল আর গ্যালভানির নতুন নাম হল 'ব্যাং নাচানে অধ্যাপক। গ্যালভানির এই হঠাৎ

আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে তাঁরই দেশবাসী আলেসান্দ্রো ভোণ্টা ইলেকট্রিক ব্যাটারি আবিষ্কার করলেন।

তারপর একদিন মেঘলা আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল সেইদিন আমেরিকার বিখ্যাত মনীষী বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন রেশমি সুতো দিয়ে ঘুঁড়ি ওড়ালেন। সুতোর শেষে বাঁধা ছিল লোহার চাবি। আকাশের বিদ্যুৎ রেশমি সুতো দিয়ে নেমে এসে চাবিতে চিড়িক মারল। প্রমাণ হল যে মানুষ যে বিদ্যুৎ তৈরি



করে সেই বিদ্যুৎ আর আকাশের বিদ্যুৎ একই। ফ্রাংকলিন আরও দেখালেন বিদ্যুৎ দু রকম, পজিটিভ আর নেগেটিভ, একজনের ধর্ম 'হাঁ' আর অপরজনের ধর্ম 'না'।

এখন থেকে প্রায় এক শ' বছর আগে আঠারো বছরের ছেলে উইলিয়ম হেনরি পার্কিন কৃত্রিম উপায়ে কুইনিন তৈরি করবার চেষ্টা করছিলেন। কুইনিন পাওয়া যায় সিনকোনা গাছ থেকে। কিন্তু সেই কুইনিন তৈরি করতে গিয়ে পার্কিন হঠাৎ অ্যানিলিন মভ্ নামে এক রকম পাকা রং তৈরি করে ফেললেন।

সেই নকল উপায়ে ল্যাবরেটরিতে প্রথম পাকা রং। এই রং আবিষ্কারের ফলে ভারতবর্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ বিঘেতে নীল চাষ উঠে গেল। কাপড় রং করবার জন্যে আগে ভারত থেকে নীল বিদেশে রপ্তানি হত। কিন্তু কৃত্রিম রঙের কাছে ভারতের নীল দাঁড়াতে পারল না।

একশ' বছর আগে রবার এমন শক্ত ছিল না, ঠাণ্ডায় ফেটে যেত, গরমে গলে যেত। চার্লস গুডইয়ার সাহেব সেই রবারের স্বভাব বদলাবার চেষ্টায় ছিলেন। তিনি দেখছিলেন যে রবারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে তাকে বেশ মজবুত আর পাকাপোক্ত করা যায় কি না। একদিন এই পরীক্ষা করবার সময় হঠাৎ খানিকটা গন্ধক মেশানো রবার জ্বলন্ত উনুনে পড়ে গেল। কি আশ্চর্য ব্যাপার! গুডইয়ার যে কাজটি করতে চেষ্টা করছিলেন সেইটি পাওয়া গেল। রবারের নব জন্ম লাভ হল। রোম্যানদের আগুনের দেবতার নাম ভালকান। গুডইয়ার এই নতুন পদ্ধতির নাম দিলেন ভালকানাইজেসান।

ইংলণ্ডের বার্কশায়ারে কোনো একটি কাগজের কলে কাগজ তৈরি হচ্ছে। এক পাত্র কাগজের মণ্ডে মাড় দিতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। সেই পাত্র থেকে যে কাগজ তৈরি হল সে কাগজে লিখতে গেলেই কালি চুপসে যায়, লেখা যায় না। মালিকের হঠাৎ খেয়াল হল যে কাগজে লিখলে কালি চুপসে যায়, সে কাগজ তাহলে কালি শুষে নিতে পারে। ব্লটিং কাগজ বলে নাম দিয়ে তিনি সেই কাগজ বিক্রয় করতে আরম্ভ করলেন। যত ব্লটিং কাগজ তৈরি ছিল সব ত ফুরিয়ে গেলই বরঞ্চ তিনি আরও ব্লটিং কাগজের অর্ডার পেলেন।

ফরাসি বৈজ্ঞানিক এডুয়ার্ড বেনেডিক্টাসের হাত থেকে হঠাৎ

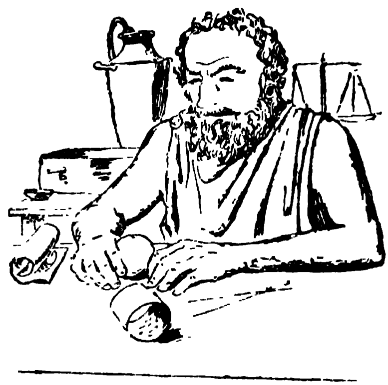
একটি বোতল পড়ে গেল। বোতলটি ভেঙে গেলেও কাঁচের টুকরো এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল না। কিন্তু ব্যাপার খোঁজ করতে গিয়ে বেনেডিক্টাস দেখলেন যে বোতলে ছিল কিছু কলোডিয়ান নামে এক রকম রাসায়নিক দ্রব্য যার খানিকটা উবে গিয়ে বোতলের ভেতর কাঁচের ওপর একটা পাতলা আবরণ ফেলেছিল যা টুকরো কাঁচগুলিকে ধরে রাখতে পেরেছিল। বেনেডিক্টাস এই থেকে ইঙ্গিত পেয়ে দুখানা কাঁচের মধ্যে কাগজের মতো পাতলা নাইট্রো-সেলুলোজের পাত ঢুকিয়ে দিয়ে শ্যাটারপ্রুফ কাঁচ তৈরি করলেন। এ কাঁচ ভাঙলেও ছিট্‌কে কারও ক্ষতি করবে না। মোটরগাড়ির উইণ্ডস্ক্রিনে এই রকম কাঁচ বসানো হয়।

ইউরেনিয়াম থেকে আপনাআপনি এক রকম রশ্মি বেরয়; ইউরেনিয়ামের এই গুণ হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়েছিল। বেকেরেল ছিলেন প্যারিসে বিজ্ঞানের অধ্যাপক। একদিন তিনি তাঁর ল্যাবরেটরিতে একটা টেবিলের দেরাজে কালো কাগজে মুড়ে ছবি তোলবার একখানা প্লেট রেখেছিলেন। সেই প্লেটের ওপর কিছুটা ইউরেনিয়াম ছিল আর ছিল ভুলে রাখা একটি চাবি তাদের মধ্যে। বেশ কিছুদিন পরে তাঁর সেই প্লেটখানির কথা মনে হল। হঠাৎ কোনো কারণে তিনি প্লেটখানি ডেভলাপ করে দেখলেন যে তাতে একটি চাবির ছবি ফুটে উঠেছে। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইউরেনিয়ামের রশ্মি ধরা পড়ল আর সেই সূত্রে মাদাম কুরি ও তাঁর স্বামী পিয়ের কুরি রেডিয়াম আবিষ্কার করলেন।

সিসিলি দ্বীপে সাইরাকিউজের রাজা একটি সোনার মুকুট তৈরি করালেন। রাজার সন্দেহ হল যে মুকুটটিতে রূপোর খাদ

মেশানো আছে কিন্তু মুকুটটি এত সুন্দর ভাবে তৈরি হয়েছিল যে রাজার ভাঙতে ইচ্ছে হল না। তখন তিনি তাঁর দেশের স্বনামধন্য বিজ্ঞানী আর্কিমিডসের ওপর ভার দিলেন, সোনার মুকুটে রূপোর খাদ মেশানো আছে কিনা খুঁজে বার করতে।

আর্কিমিডস কিছুতেই সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না। সেই সময়ে তিনি পুরোপুরি জল ভর্তি টবে স্নান করতে নেমেছেন, যেই টবে বসলেন অমনি খানিকটা জল উপ্‌চে পড়ে গেল। তক্ষুণি তিনি ইউরেকা, ইউরেকা (পেয়েছি, পেয়েছি) বলে চিৎকার করে রাজার কাছে ছুটলেন। একটা খাঁটি সোনার মুকুট জলভর্তি পাত্রে ডোবালে যতখানি জল উপ্‌চে পড়বে, খাঁটি রূপোর একটা মুকুট জলে ডোবালে এর প্রায় দ্বিগুণ জল উপচে পড়বে। সোনা-রূপোয়



মেশানো মুকুট জলে ডোবালে এ দুইয়ের মাঝামাঝি জল উপচে পড়বে। আর্কিমিডস এই থেকে প্রমাণ করলেন যে রাজার অনুমানই ঠিক। সোনার মুকুটে রূপোর খাদ মেশানো আছে।

এই থেকে আবিষ্কৃত হলে আর্কিমিডসের সূত্র। কোনো পদার্থ জলে ডুবিয়ে ওজন করলে তার সম-আয়তনের জলের ওজন হারায়। এক খণ্ড লোহাকে ওজন করা হল, আবার যখন জলে ডুবিয়ে সেই লোহাকে ওজন করা হল তখন তার ওজন কম হল। কতখানি কম হল। লোহাটিকে একটি জলভর্তি পাত্রে ডুবিয়ে দিলে যতখানি জল উপচে পড়বে সেইটুকু জল তুলে

নিয়ে ওজন করলে তার যা ওজন, জলে ডোবানো লোহার ওজন ততখানি কমবে। আর্কিমিডসের এই সূত্র আজ দু' হাজার বছর পরেও চালু আছে।

বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারের জন্যে ইয়োরোপে এককালে বিজ্ঞানীদের প্রাণ গেছে, জেল খাটতে হয়েছে বা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। এ ত অনেক দিন আগের কথা। এডিসন যখন ইলেকট্রিক বাল্‌ব আবিষ্কার করলেন তখন আমেরিকাবাসীরা হেসেছিল, তেল নেই, মোম নেই, ফাঁকাতে কি করে আলো জ্বলবে?

আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেল যখন টেলিফোন আবিষ্কার করলেন তখন কাগজে সম্পাদকীয় বেরুল, লোকটা বলে কি? তার দিয়ে মানুষের কথা পাঠাবে?

টাইপরাইটারকে ত প্রথম প্রথম খেলনা বলে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল; তারপরও যখন চালু হল তখন যারা টাইপ করত তারা অসুস্থ হলে দোষটা টাইপরাইটারের ওপর চাপানো হত।

মাইকেল ফ্যারাডের আবিষ্কারের জন্যেই যে আজ আলো জ্বলছে, কারখানা চলছে বৈদ্যুতিক শক্তিতে সে কথা আজ সবাই জানে। কিন্তু মাইকেল ফ্যারাডে রয়েল সোসাইটিতে তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে পরীক্ষা দেখাবার পর তখনকার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ফ্যারাডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ মানুষের কি কাজে লাগবে?

ফ্যারাডে উত্তর দিয়েছিলেন—হয়ত এমন দিন আসবে যখন এ দিয়ে আপনি অনেক ট্যাক্স আদায় করতে পারবেন।

ধায় গাড়ি ধূম ছাড়ি

যদি বলি ইঞ্জিন? তাহলে সঙ্গে সঙ্গে রেল ইঞ্জিনের কথা মনে পড়বে, যে ইঞ্জিন ধোঁয়া ছেড়ে, ঝক্‌ঝক্‌ করতে করতে সিটি বাজিয়ে চকচকে রেল লাইনের ওপর দিয়ে গাড়ি টানতে টানতে এক দেশ থেকে আর এক দেশে যায়।

ঠিক। সে ইঞ্জিনও ইঞ্জিন, রেলগাড়ি টানে। ইঞ্জিন যেন একটা দৈত্য। তার গায়ে ভীষণ জোর। সে কত রকমেরই না কাজ করে। রেলগাড়ি ত টানতেই পারে, তাছাড়া জাহাজ চালায়, মাটির অনেক নীচে থেকে জল পাম্প করে ওপরে তোলে, বড় বড় কলকারখানা চালায়, মোটর গাড়ি, লরি, দোতলা বাস, আকাশে বড় বড় উড়োজাহাজ চালায়, আরও যে কত রকম কাজ করে সব লিখলে মস্ত লম্বা একখানা ফর্দ হয়ে যাবে।

এবার যদি জিজ্ঞাসা করি, ইঞ্জিন কে চালায়? তাহলে হয়ত চট্‌ করে উত্তর হবে, কেন? ড্রাইভার চালায়? তা সত্যি। ড্রাইভারই চালায়। কিন্তু ড্রাইভারের কাজ হল ইঞ্জিনকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, দরকার হলে ঠিক সময়ে থামানো, জোরে বা আস্তে চালানো। ইঞ্জিনের গায়ের যে জোর, সে জোরটা আসে কোথা থেকে?

ইঞ্জিন তার জোর পায় জল থেকে, পেট্রল থেকে আর নয়ত ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ থেকে। যে ইঞ্জিন জল খায় তার নাম স্টিম ইঞ্জিন, তারা রেলগাড়ি টানে, স্টিমার চালায়। যে ইঞ্জিন পেট্রল খায় তারা হল পেট্রল ইঞ্জিন, যারা লরি, বাস, মোটর বা ছোট ছোট কারখানা চালায়। যারা ইলেকট্রিক নিয়ে চলে তারা হল ইলেকট্রিক ইঞ্জিন।

স্টিম মানে চলতি কথায় বাষ্প। স্টিমের ভীষণ জোর। বয়লারে জল গরম হয়ে স্টিম তৈরি হয়। সেই স্টিম ইঞ্জিনকে চালায়। সেই স্টিমের এত জোর যে তাই দিয়ে পাঞ্জাব মেল, তুফান মেল কী ভীষণ জোরে আর কত গাড়ি আর লোক নিয়ে শত শত মাইল দৌড়য়।

স্টিমের যে এত জোর থাকতে পারে সেটি কিন্তু একটি ছোট



ছেলের মাথায় প্রথম এসেছিল। সেই ছেলেটির নাম জেমস ওয়াট। জেমস ওয়াট যা আবিষ্কার করে গেছেন তার ফলেই পৃথিবীতে কলকারখানা চালু হয়েছে। আগে যন্ত্রের কারখানা ছিল না, হাত দিয়ে যতদূর সম্ভব কাজ করা যায় তাই করা হত। কিন্তু জেমস ওয়াট তৈরি করলেন ইঞ্জিন যে ইঞ্জিন গাড়ি টানে, পাম্প করে খনি থেকে জল তোলে, ধান ভানে, স্টিমার চালায়, কারখানায় কত রকমের কাজ করে।

জেমস ওয়াট যে ইঞ্জিনটা তৈরি করেছিলেন সে ইঞ্জিন এক জায়গায় বসে কাজ করে। সেই ইঞ্জিনকে দিয়ে গাড়ি চালানো এটা ক্রমে অনেকের মাথায় এল।

প্রথম সচল ইঞ্জিন তৈরি করেন উইলিয়ম মার্ডক। সে ইঞ্জিন আজকালের ইঞ্জিনের তুলনায় একেবারেই খেলনা। এখনকার খেলনার ইঞ্জিনই কত ভাল। তাহলেও সেই প্রথম ইঞ্জিন হয়েছিল বলেই ত অন্য লোকেরা তাকে ভাল করবার চেষ্টা করতে করতে আজকে বড় বড় ইঞ্জিন তৈরি হয়েছে।

সেই ইঞ্জিন কিন্তু চলেছিল মাত্র একটি রাত্রি। দিনের বেলায় সে ইঞ্জিন চালাবার সাহস মার্ডকের হয় নি। তাই রাত্রে গ্রামের সকলে যখন ঘুমিয়ে আছে তখন মার্ডক ইঞ্জিন নিয়ে অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, ভীষণ আওয়াজ হচ্ছে আর চোঙা দিয়ে লাল আগুনের শিখা বেরুচ্ছে। যাদের ঘুম ভেঙে গেল, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে ভয়ে জানালা বন্ধ করে দিয়ে ভগবানের নাম স্মরণ করে শুয়ে পড়ল।

গির্জের সামনে ইঞ্জিন পৌঁছতে পাদ্রী সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি সেই দৃশ্য দেখে মনে করলেন বুঝি শয়তান মশাল জ্বালিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। লোকে যখন জানল যে এ হল মার্ডকের কীর্তি তখন তারা ধরে নিল যে স্বয়ং শয়তান মার্ডকের কাঁধে ভর করেছে, তার আর নিস্তার নেই।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে জর্জ স্টিফেনসন ভাল ইঞ্জিন তৈরি করলেন। তারপর ঠিক হল যে ইংলণ্ডে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে লিভারপুল পর্যন্ত রেল লাইন খোলা হবে তখন দেশের অনেক লোক রীতিমতো ক্ষেপে উঠল। এমন কি পার্লামেণ্টের সভ্যরা

পর্যন্ত বাধা দিলেন। তাঁরা বললেন, এ কি সর্বনাশ, লোকটার মাথা খারাপ নাকি? ইঞ্জিনের আগুনে যে দু পাশের গ্রাম পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে, গরু বাছুর চলতে পারবে না, দুধে বিষাক্ত জিনিস পড়বে, আরও কত কি। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের জয় হল।

সাইকেল ও মোটরগাড়ি

আপনার হয়ত একখানা সাইকেল আছে, আপনার না থাকলেও বন্ধু গোপাল চৌধুরীর আছে। কারও না থাকলেও সাইকেল চড়তে নিশ্চয়ই জানেন। সাইকেল চড়া শেখবার জন্যে বাড়িতে কত বকুনি খেয়েছেন, কত আছাড় খেয়েছেন। আজকাল সাইকেল চড়তে জানে না এমন লোক খুব কম আছে। বাড়িতে একখানা সাইকেল থাকলে কাজের অনেক সুবিধে হয়।

আজকাল সাইকেলখানিকে যেমন দেখা যায়, গোড়ায় গোড়ায় অবশ্য এমন দেখতে ছিল না। সে সাইকেলের কোনো কলকব্জাই ছিল না। সাইকেল আবিষ্কৃত হয়েছে এখন থেকে এক শ' বছর আগে, ইংরেজি ১৮৬০ সালে। আরনেস্ট মিচার্ড নাকি প্রথম সাইকেল তৈরি করেন। সে সাইকেলের প্যাডেল ছিল না, একখানা চাকার ওপর একটা সীট আর হ্যাণ্ডেল থাকত। সে সাইকেল চালাতে হত মাটির ওপর দু পায়ের ধাক্কা দিয়ে। সে সাইকেলের নাম ছিল 'হবি হর্স' বা শখের ঘোড়া।

বছর ছয়েক পরে আর একজন বুদ্ধি করে আর একখানা চাকা লাগালো, আর যে চাকায় সীট ছিল তাইতে প্যাডেল লাগালো। তখনও কিন্তু হাওয়া ভরা টিউব আবিষ্কৃত হয়নি,

চেনও আবিষ্কৃত হয়নি; সেকালে রাস্তাও ছিল খারাপ, তাই এই সব সাইকেল যখন চলত তখন রীতিমতো ঝাঁকুনি লাগত, হাড়গুলো যেন খটাখট্ করে নাচত; তাই অনেকে ঠাট্টা করে এই সব সাইকেলের নাম দিলেন 'বোন শেকার'।

এই সাইকেলে সুবিধে হল না। একজন একখানা সাইকেল তৈরি করলেন যার আগেকার চাকাখানা বড় আর পিছনেরটা ছোট; আর একজন আর একখানা সাইকেল তৈরি করল যার আবার আগেকার চাকাখানা ছোট, পিছনেরখানা বড়।

লোকে ক্রমশঃ বুঝল যে সাইকেল একটা কাজের জিনিস, নিখরচায় গাড়ি চড়ার আনন্দ পাওয়া যায় অথচ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় যদি এর আরও উন্নতি করা যায়।

অ্যালবার্ট পোপ নামে একজন মিলিটারি সাহেব অনেক মাথা ঘামিয়ে একখানা সাইকেল তৈরি করলেন। সে সাইকেলের সঙ্গে আজকালকার সাইকেলের কিছু মিল আছে তবে সিঙ্গার সাহেব যে সাইকেল তৈরি করেছিলেন তার সঙ্গে আজকালকার সাইকেলের বেশি রকম তফাৎ কিছু নেই।

পোপ সাহেব দেখলেন, তিনি যে সাইকেল তৈরি করেছেন তাতে অনেক খরচ পড়ে। দামও বেড়ে যাবে। তাই তিনি বুদ্ধি করে সাইকেলের আলাদা আলাদা অংশগুলি বাইরে আলাদা আলাদা কারখানা থেকে তৈরি করিয়ে আনতে লাগলেন। আজকাল অনেকে এইভাবে সাইকেলের পার্টস যেমন মাডগার্ড, স্পোক, রিম, হ্যাণ্ডেল, ফ্রেম; বাইরে থেকে তৈরি করিয়ে আনান। এতে খরচ অনেক কম পড়ে।

সাইকেলের উন্নতির জন্যে অনেকেরই কৃতিত্ব আছে কিন্তু

তার মধ্যে জন বয়েড ডানলপ-এর কৃতিত্বই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি।

ডানলপ সাহেব ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের লোক, তিনি বসবাস করতেন আয়ারল্যাণ্ডের বেলফাস্ট শহরে। তিনি ছিলেন ঘোড়ার ডাক্তার।

১৮৮৭ সালের একদিন তাঁর ছেলে জনি এসে বলল যে তাদের স্কুলে তিন চাকার সাইকেলের রেস হবে। তা তার সাইকেলটায় বড় বেশি ঝাঁকুনি লাগে। বাবা এমন কিছু কি করতে পারে যাতে ঝাঁকুনি কম লাগবে। জনির সাইকেলে নীরেট টায়ার লাগানো ছিল।

ডানলপ বাগানে জল দেবার রবারের খানিকটা হোসপাইপ কেটে তার ভেতর হাওয়া ভরে জনির সাইকেলের পেছনের চাকা দুটোতে ক্যাম্বিসের টুকরো দিয়ে বেঁধে দিলেন। জনি সেই রেসে ফার্স্ট হল।

তারপর ডানলপ সাহেব এক সাইকেল কারখানার সঙ্গে যোগাযোগ করে সাইকেলের টিউব তৈরি করতে লাগলেন। আজকাল ত টায়ার টিউব বললেই ডানলপের কথা আগে মনে পড়ে। টায়ার আর টিউব আবিষ্কৃত হওয়ায় সাইকেলের খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি হল। তবে সেই সময় রাস্তায় মোটরগাড়ি চলতে শুরু করায় অনেক সাইকেলওয়ালা মোটরগাড়ি তৈরি করতে আরম্ভ করল। তখনকার অনেক মোটরগাড়ির আর সাইকেলের একই নাম ছিল। উইলবার রাইট আর অরভিল রাইট যারা আধুনিক বিমান তৈরি করেছিলেন তাঁদেরও সাইকেলের কারখানা ছিল।

সব জিনিসেরই একটা আরম্ভ আছে। যদি বলি রাইফেল

আর পিয়ানো আরম্ভ হয়েছে ধনুক থেকে তাহলে হয়ত বিশ্বাস হবে না। সেই আদ্দিকালে মানুষের যখন তীর ধনুক ছাড়া আর কোনো অস্ত্র ছিল না সেইকালে ধনুক থেকে তীর ছাড়বার সময় ধনুকের ছিলায় যে টং করে শব্দ হত সেই শব্দটা হয়ত কোনো একজন গুণী আদিবাসীর কানে ভাল লেগেছিল। সে হয়ত ধনুকের ছিলেটাকে অবসর সময়ে হাত দিয়ে টেনে টেনে টুং টাং আওয়াজ করত। তারপরে আর কেউ হয়ত তাই থেকে একটা তারের বাজনা তৈরি করল। তার উন্নতি হতে হতে অনেকদিন পরে পিয়ানো তৈরি হল। রাইফেলও এইভাবেই এসেছে। অবশ্য সেকালের সেই আদিবাসীরা কখনও কল্পনা করেনি যে তাদের তীর ধনুক থেকে একদিন পিয়ানো আর রাইফেল তৈরি হতে পারবে।

তাই ক্রিশ্চিয়ান হয়গেন্স, জন স্ট্রিট কিংবা লি বন এঁরা বিভিন্ন সময়ে যখন এমন যন্ত্র তৈরির চেষ্টা করছিলেন যা মানুষের অনেক খাটুনি কমাতে পারবে তখন তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি যে তাঁরা ভবিষ্যৎ মোটরগাড়ির বীজ পুঁতছেন।

অবশ্য মোটরগাড়ির সর্বপ্রথম ধাপ হিসেবে ১৭৭০ সালে মানে প্রায় ২০০ বছর আগে ফ্রান্সের নিকলাস কুনো বাষ্প-শক্তির দ্বারা চালিত প্রথম যে তিন চাকার গাড়িটি তৈরি করেছিলেন সেটি যদি তোমরা কেউ এখন দেখ তাহলে নিশ্চয় হেসে ফেলবে। তবে জেনে রেখ একদিনে কেউ বড় হয় না, এক দিনেই বড় কিছুই গজিয়ে ওঠে না।

পেট্রল আবিষ্কৃত হয় ১৮৫৯ সালে অতএব পেট্রলের দ্বারা চালিত ইঞ্জিন তার পরেই আবিষ্কৃত হয়েছিল।

১৮৭৬ সালে জার্মানির কলোন শহরের একজন ইঞ্জিনিয়ার

যার নাম ডঃ নিকলাউস অটো একখানা ইঞ্জিন তৈরি করেন। আর এর বছর দশেক পরে তাঁর স্বদেশবাসী কার্ল বেঞ্জ অটো সাহেবের অনুকরণে সাইকেলের মতো তিন চাকার একখানা গাড়ি রাস্তায় চালান।

এঁদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেলেন গটলিব ডেমলার। ইনিও জার্মানির লোক এবং একদা নিকলাউস অটোর কারখানায় কাজ করতেন। ইংলণ্ডে গিয়ে আরও কিছু কাজ শিখে দেশে ফিরে এসে তিনি নিজেই একটা কারখানা করেন আর সেই কারখানায় পেট্রল দ্বারা চালিত প্রথম রীতিমতো মোটর ইঞ্জিন তৈরি করেন। তাঁর মোটরগাড়ি তৈরি করবার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু যা অবধারিত তা হয়েছে, সেই ইঞ্জিন গাড়িতে বসিয়ে মোটরগাড়ি তৈরি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ডেমলারের কারখানায় ডেমলার ও মার্সিডিজ নামে গাড়ি তৈরি হত। মার্সিডিজ ছিল ডেমলারের মেয়ের নাম। পরে সম্ভবতঃ ডেমলারের আর কার্ল বেঞ্জের কারখানা যুক্ত হয়েছিল যার ফলে মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি চালু হয়েছিল।

এইখানে একটা ছোট গল্প বলে নি। বেঞ্জ সাহেব একখানা গাড়ি তৈরি করেছিলেন। গাড়িখানা তাঁর বাড়িতেই ছিল। তিনি একবার কয়েকদিনের জন্যে বিদেশে গেছেন সেই সুযোগে তাঁর দুই ছেলে, একজনের বয়স ১৫ আর অপর জনের ১৩, এরা দুজনে গাড়িখানি হাঁকিয়ে ৬০ মাইল দূরে ফরজাইমে চলে যায়। বেঞ্জ সাহেব বাড়ি ফিরে দেখেন গাড়ি নেই, ছেলে দুজনও নেই। বেঞ্জ সাহেব বেশ উদ্বিগ্ন হলেন। অবশেষে ছেলে দুজন বাড়ি ফিরে এল। বেঞ্জ সাহেব যদিও তাদের প্রহার দিয়েছিলেন বলে প্রকাশ, মনে মনে কিন্তু তিনি ভারি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কারণ

নামে তখন পর্যন্ত মোটরগাড়ি ছেলেখেলা হলেও কাজেও দেখা গেল মোটরগাড়ি চালানো ছেলেখেলা।

ফ্রান্সে বেঞ্জ সাহেবই প্রথম ট্যাক্সি সরবরাহ করেন। সে যুগে মোটরগাড়ির ড্রাইভারদের সঙ্গে আর ঘোড়ারগাড়ির কোচম্যানদের সঙ্গে যাত্রী নিয়ে প্রায়ই মারামারি লাগত। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সেও মোটরগাড়ির কারখানা বসে, মোটর-গাড়ি তৈরি হয় আর প্রথম মোটর রেস ফ্রান্সেই হয়েছিল।

ইংলণ্ড কিন্তু তখনও পিছিয়ে পড়েছিল যদিও এখন ইংলণ্ডের মতো ভাল গাড়ি কেউ তৈরি করতে পারে না। ইংলণ্ডে তখন উল্টে একটা মজার আইন চালু ছিল। সে আইনের নাম "লাল পতাকা আইন"। ঘোড়া ছাড়া কোনো গাড়ি ঘণ্টায় চার মাইলের বেশি জোরে খোলা রাস্তা দিয়ে যেতে পারবে না আর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে হলে ঘণ্টায় দু' মাইলের বেশি নয় উপরন্তু সেই সব গাড়ির আগে একজন লোককে হাতে একটি লাল পতাকা নিয়ে ছুটে ছুটে যেতে হবে।

ইয়োরোপের মোটরগাড়ির খবর যখন আমেরিকায় পৌঁছলো তখন সেখানে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হল। যার যেমন কারখানা ছিল সে সেই কারখানাতেই মোটরগাড়ি তৈরি করতে চেষ্টা করল। আমেরিকায় প্রথম মোটরগাড়ি তৈরি করেছিলেন রচেস্টারের জর্জ বি সেলডন।

মোটরগাড়িকে যিনি জনপ্রিয় করে তোলেন তাঁর নাম হেনরি ফোর্ড। ফোর্ড যখন বালকমাত্র তখন তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে মিচিগানের ক্ষেতে কাজ করতেন, গরুও চরাতেন। এই ফোর্ডের নাম যে একদিন সারা পৃথিবীতে লোকের মুখে মুখে ঘুরবে তা তখন কেউ ভাবতেও পারেনি। সেই বয়সে ফোর্ড

একটা ট্র্যাক্টরের ইঞ্জিন দেখে অবাক হয়ে যান। তিনি সেটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। ফোর্ড সাহেব সেই বয়সেই ঘড়ির কলকব্জা খুলে আবার বসিয়ে দিতে পারতেন। যন্ত্রপাতির কাজ তিনি কিছু কিছু শিখেছিলেন।

তাঁর বয়স যখন ১৭ তখন স্কুলের পড়া ছেড়ে তিনি ডেট্রয়েটে এক কারখানায় কাজ শিখতে গেলেন। সেখানে তিনি ইঞ্জিনের কলকব্জার কাজ বোঝবার চেষ্টা করতেন। এই কাজ তাঁর এত ভাল লাগত যে দিনে ১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত খাটতেন, সপ্তাহে মাইনে পেতেন মাত্র আড়াই ডলার।

তাঁর বাবা তাঁকে ক্ষেতে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন, ফিরিয়ে আনলেনও। কিন্তু ফোর্ড শেষ পর্যন্ত বাড়িতে থাকতে পারলেন না। তিনি আবার ডেট্রয়েটে ফিরে গিয়ে ডেট্রয়েট এডিসন কম্পানিতে কাজ করতে লাগলেন। শীঘ্রই তিনি এই কম্পানির চীফ ইঞ্জিনিয়ার হলেন।

পরে তিনি এই চাকরী ছেড়ে দিয়ে নিজে স্বাধীনভাবে গাড়ি তৈরি করবার জন্যে একটা কারখানা করেন।

১৮৯২ সালে তাঁর বয়স যখন ২৯ বৎসর তখন তিনি নিজে চার ঘোড়ার জোরের দুই সিলিণ্ডারের প্রথম ফোর্ড গাড়ি রাস্তায় চালান। তখন রাত্রি, বৃষ্টি পড়ছিল। স্বামীকে বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্যে মিসেস ফোর্ড স্বামীর মাথায় ছাতা ধরে গাড়ির সঙ্গে দৌড়েছিলেন।

আজ আর মোটরগাড়ি বিলাসের সামগ্রী নয়, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হয়েছে।

উড়োজাহাজের যুগ

আজকাল এরোপ্লেনের এতদূর উন্নতি হয়েছে যে দিল্লী বোম্বাই এপাড়া ওপাড়া মনে হয়। সকালে দিল্লী রওনা হয়ে সন্ধ্যার আগে অনায়াসে কলকাতায় ফিরে আসা যায়। লণ্ডন পৌঁছনো যায় চব্বিশ ঘণ্টায়, নিউ ইয়র্ক আটচল্লিশ ঘণ্টায়। শোনা যায় যে আমেরিকানরা নিউ ইয়র্ক বা ওয়াশিংটনের বিমান ঘাঁটিতে মোটরগাড়ি রেখে ইয়োরোপে পাড়ি দিয়ে দু' তিন দিনের মধ্যে ফিরে আসে।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ছিলেন ইটালির একজন খুব বড় শিল্পী। ছবি আঁকা ছাড়াও তাঁর অনেক রকম গুণ ছিল। বিমান বিজ্ঞানের আরম্ভটা তিনিই করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন আর উড়ুক্কু কলের একটা স্কেচও করেছিলেন। প্যারাশুট নাকি তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। এ সব প্রায় ৫০০ বছর আগের কথা।

সরু লোহার রডের ফ্রেমে কাপড় লাগিয়ে চারটে নকল ডানা তৈরি করে বেসমার এক গ্লাইডার যন্ত্র তৈরি করেন। তিনি দুটো ডানা হাতে আর দুটো ডানা পায়ে লাগাতেন। এক বাড়ির ছাদ থেকে লাফ মেরে দূরে আর একটা বাড়ির ছাদে নামতে পারতেন।

ফ্রান্সের ব্যাকভিলে সাহেব তাঁকে নকল করে সিন নদী পার হতে গিয়ে এক বজরার ওপরে আছাড় খেয়ে পড়েন। কিছু জখমও হয়েছিলেন।

ফরাসি দেশের দুই মোশগোলফিয়ের ভাই বেলুন আবিষ্কার করলেন। তাঁরা অনেক বেলুন তৈরিও করলেন। ১৭৮২

সালে ইয়োরোপে বেলুনের রেসও হত, তাই নিয়ে বাজীও ধরা হত, কে রেসে জিতবে? তখনকার কালে বেলুনে গরম হাওয়া ভরা হত। গরম হাওয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার চেয়ে হাল্কা অতএব আকাশে উড়বে। হাওয়া ভরা ব্যাপারটা নিরাপদ ছিল না, অনেক সময় বেলুনে আগুন ধরে যেত।

রোজিয়ার নামে এক ভদ্রলোক বেলুনে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরতেন। তিন হাজার ফুট ওপরে তাঁর বেলুনে একবার আগুন ধরে যায়। পাহাড়ের গায়ে পড়ে তিনি মারা যান। বিমানের উন্নতির পথে তিনিই প্রথম শহীদ। এ হল ১৭৮৫ সালে। এই বছরই একজন মার্কিন, ডক্টর জেফ্রিস, বেলুনে চড়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হলেন। সে কি উত্তেজনা!

এর অনেকদিন পরে ১৮৬২ সালে দুজন দুঃসাহসিক বেলুনবিদ্, কক্সওয়েল আর গ্ল্যাশিয়ার বেলুনে চেপে উঠতে উঠতে সাত মাইল ওপরে উঠে গেল। অত উঁচুতে উঠে অক্সিজেনের অভাবে দু'জনেই বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ে, কিন্তু কক্সওয়েল বুদ্ধি করে দাঁত দিয়ে গ্যাস বার করবার দড়িটা টেনে দিলেন। তখন বেলুন ধীরে ধীরে নীচে নামল। সেকালে ইয়োরোপে বেলুন খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

একজন প্যারিসে বেলুনে চেপে মস্কোয় গিয়ে নামল। বেলুনের পর আমদানী হয়েছিল ডিরিজিবলের। ডিরিজিবল আর বেলুনের তফাৎ বেশি ছিল না। বেলুন ছিল গোল আর ডিরিজিবল লম্বা বর্মা চুরুটের মত। সেকালে ডিরিজিবল হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে ভর্তি করা হত।

গ্লাইডার নিয়ে আবার নাড়াচাড়া শুরু হল। লিলিয়েন্থলি অনেকগুলি ভালো ভালো গ্লাইডার তৈরি করেছিলেন। তিনি

একটা গ্লাইডারে একটা ইঞ্জিন বসান ; দুর্ভাগ্যের বিষয় পরীক্ষার প্রথম দিনেই তিনি মারা যান।

মানুষের এইবার সত্যিই ওড়বার ইচ্ছে খুব প্রবল হল। একজন মার্কিন, ডক্টর ল্যাংলি, উঠে পড়ে লাগলেন। তিনি একটা বিমান তৈরি করলেন। প্রথমবারেই তিনি অকৃতকার্য হলেন, তাঁর বিমানখানিকে সকলে "ল্যাংলির বোকামি" বলে ঠাট্টা করতে ছাড়ল না। তিনি দমেন নি। বার বার তিনবার তিনখানা বিমান তৈরি করেন কিন্তু বেচারী একবারও উড়তে পারেন নি। কিন্তু গ্লেন কার্টিস নামে আর একজন লোক ল্যাংলির বিমানের গলদ ধরে ফেলেন। গলদ ঠিক করে তিনি সেই বিমানে চেপে খানিকটা উড়তে পেরেছিলেন।

বিমানের ইতিহাসে এবার এলেন উইলবার আর অরভিল রাইট ; এরা দুই ভাই। সময়টা ১৮৯০, বাইসাইকেল তখন উঠেছে, বিক্রিও হচ্ছে। রাইট ভাইয়েরা একটা সাইকেলের কারখানা করেন, সেখানে তাঁরা সাইকেল তৈরি করতেন। সাইকেলের এক রকম নতুন ব্রেক তাঁরা তৈরি করেছিলেন।

লিলিয়েন্থাল বিমান দুর্ঘটনায় মারা পড়লেন। উইলবার রাইট ভাবলেন যে লিলিয়েন্থালের বিমানখানার কোথাও কোনো গলদ ছিল। উইলবার বিমান সম্বন্ধে যা কিছু পেলেন পড়তে লাগলেন, শিখতে লাগলেন, নিজে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। আগেকার বিমানগুলিতে যে সব খুঁত ছিল সে সব বোঝবার চেষ্টা করলেন। তারপর নিজেই একখানা ভাল বিমান তৈরি করতে উঠে পড়ে লাগলেন।

আমেরিকার একটি রাজ্যের নাম নর্থ ক্যারোলিনা। সেইখানে একটা জায়গার নাম কিটি হক। কিটি হকে রাইট

ব্রাদার্সের কারখানায় নতুন বিমান তৈরি হতে লাগল। ১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তাঁরা নিজেদের তৈরি বিমানে ৮৫২ ফুট ওপরে উঠলেন। তাঁরা ক্রমশঃ বিমানের অনেক উন্নতি করলেন, ২৫ মাইল পর্যন্ত উড়তে পারলেন। ১৯০৮ সালে তাঁরা বেশ ভাল ও সম্পূর্ণ নিরাপদ বিমান তৈরি করলেন।

তারপর থেকে বিমানের খুব উন্নতি হতে থাকল। কতটা উন্নতি হয়েছে তা ত আজকাল দেখাই যাচ্ছে।

পেট্রল

এতদিন জানা ছিল যে ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল আসামেই পেট্রল পাওয়া যায়, কিন্তু কিছুদিন হল জানা গেছে যে গুজরাটেও পেট্রল আছে। আরও পেট্রল হয়ত অন্য জায়গাতেও পাওয়া যেতে পারে। দেশে যখন পেট্রল পাওয়া যাচ্ছে তখন পেট্রল সম্বন্ধে কিছু জেনে রাখা ভাল।

আজ যদি পৃথিবীর সমস্ত পেট্রল উবে যায় তাহলে আমাদের এক শত বছর পিছিয়ে যেতে হবে যখন পেট্রল সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা ছিল না। শুধুই যে মোটরগাড়ি, বাস, লরি, এরোপ্লেন, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে তাই নয়, কেরসিন তেলের অভাবে কত আলো যাবে নিভে, রাস্তায় ঢালবার জন্যে পিচ পাওয়া যাবে না, যন্ত্রপাতিতে দেবার জন্যে পাওয়া যাবে না লুব্রিকেটিং অয়েল (চলতি কথায় যাকে মবিল বলে) ; তাছাড়া অনেক রকম ওষুধ, গ্রিজ, পমেটম , এ সবও পাওয়া যাবে না।

নারকেল তেল, সরিষার তেল, বাদাম তেল এসব পাওয়া যায় গাছ থেকে কিন্তু পেট্রল পাওয়া যায় কয়লার মতো মাটির নীচে।

পৃথিবীর অনেক দেশেই পেট্রল পাওয়া যায় যেমন, রাশিয়া, আমেরিকা, ইরাক, ইরান, রুমানিয়া; আরও কত দেশে।

পেট্রল থেকেই পিচ পাওয়া যায়। যেখানে মাটির মধ্যে অনেক পেট্রল আছে সেখানে অনেক সময় সেই মাটির ওপরে পেট্রল সমেত পিচ ভাসতে দেখা যায়। শোনা যায় যীশু জন্মাবার চার হাজার বছর আগে পিচের ব্যবহার ছিল। সে যুগে চ্যাল্ডিয়া নামে এক দেশ ছিল। সেই চ্যাল্ডিয়ার একটি শহরের নাম ছিল উর। উর শহরের ধ্বংস খোঁড়বার সময় জানা যায় যে বাড়ির গাঁথুনি পিচ দিয়ে মজবুত করা হয়েছিল।

মিশরের মমীর কথা তোমরা শুনেছ। মমীগুলি রক্ষা করবার জন্য পিচ ব্যবহার করা হত। অ্যালেকজাণ্ডার যখন পারস্যের দিকে আসছিলেন তখন পথে মেসপটেমিয়াতে তিনি আলেয়ার আগুন আর তেলের হ্রদ দেখেছিলেন। আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানরা মাটি চুঁয়ে ওঠা তেল তুলে তাকে ছেঁকে ওষুধ তৈরি করত। এসব ত হল অনেক কাল আগেকার কথা।

আজকালকার যুগে তেলের প্রথম সন্ধান মেলে ১৮২৯ সালে, আমেরিকার কেণ্টাকিতে। তারপরে আরও কোনো কোনো জায়গায় পেট্রল পাওয়া গেল। কিন্তু সেই পেট্রল কী কাজে লাগবে তখনকার লোকের সে বিষয়ে কোনো ধারণা ছিল না। একজন বুদ্ধি করে সেই চটচটে পেট্রল থেকে কেরসিন তেল তৈরি করল। সেই কেরসিন দিয়ে আলো জ্বালানো গেল। তখন কেরসিন তেলকে বলা হত আর্থ অয়েল বা মাটির তেল। আমাদের দেশে এখনও 'মাটিয়া তেল' কথাটি চালু আছে।

কেরসিন তেল বেশ বিক্রি হতে লাগল। যা থেকে

কেরসিন তেল তৈরি হয় সেই পেট্রল ত পাওয়া যায় মাটিতে কুয়ো খুঁড়ে। তখন আরও কুয়ো খুঁড়ে আরও তেল তোলবার জন্যে একজন ব্যবসায়ী কর্ণেল ড্রেক নামে একজন লোকের ওপর ভার দিলেন। একশ' বছর আগে, ১৮৫৯ সালে পেনসিলভানিয়াতে একটা প্রায় ৭০ ফুট গভীর কুয়ো খুঁড়ে কুড়ি পিপে পেট্রল পাওয়া গেল। সেই হল পেট্রল যুগের শুরু। তারপর পেট্রল নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরিষ্কার পেট্রল তৈরি হয়েছে; যা দিয়ে গাড়ি চলছে, উড়ছে প্লেন, চলছে কলকারখানা।

পেট্রল মাটির মধ্যে ঢুকল কি করে? অনেক কাল আগে মানে কয়েক কোটি বছর আগে পৃথিবীতে যে সব গাছপালা ছিল সেগুলি ভূমিকম্পের ফলে মাটির তলায় চলে যায়। তখন ঘন ঘন ভূমিকম্প হত। মাটির নীচে ভীষণ চাপ আর প্রচণ্ড তাপে সেই সব গাছ কয়লা হয়ে গেছে। সেই রকম তখনকার কালে যে সব নানা রকম ছোটখাটো বা বড় বড় জীবজন্তু ছিল সেগুলি মাটির নীচে চলে যায়। মাটির নীচে প্রচণ্ড তাপ আর চাপে তাদের শরীর থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে তেল বেরিয়ে এক এক জায়গায় জমা হয়ে যায়।

তোমরা পেট্রলকে যে অবস্থায় দেখ খনি থেকে কিন্তু পেট্রল সেই অবস্থায় উঠে আসে না। মাটি থেকে যা ওঠে তা খুব মোটা চট্‌চটে তেল, তার নাম ক্রুড অয়েল। ক্রুড অয়েলের সঙ্গে হালকা গ্যাস থেকে আরম্ভ করে ভারী পিচ মিশে থাকে।

সেই ক্রুড অয়েল থেকে পেট্রল, কেরসিন তেল, পিচ এবং আরও অনেক রকম সামগ্রী বার করা হয় এক কারখানায়, যার নাম রিফাইনারি। ভারতবর্ষে বোম্বাইয়ে ছুটি, বিশাখাপত্তনমে একটি আর ডিগবয়ে একটি রিফাইনারি আছে। আরও

ছু একটি রিফাইনারি বসবে। ডিগবয়ে যে রিফাইনারি আছে সেখানে আসামে যে ক্রুড অয়েল পাওয়া যায় সেগুলি পরিষ্কার করা হয়। আর বাকি তিনটি রিফাইনারির জন্যে ক্রুড অয়েল বিদেশ থেকে কিনে আনা হয়।

রিফাইনারির মধ্যে নানারকম তাপের খুপরি আছে। ক্রুড অয়েলকে সেই সব আলাদা আলাদা কম থেকে বেশি তাপের খুপরির মধ্যে দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয় আর এক এক খুপরি থেকে এক এক রকম সামগ্রী বেরিয়ে আসে। সেগুলিকে আলাদা আলাদা করে সংগ্রহ করা হয়। যেমন কোনো খুপরি থেকে বেরুলো পেট্রল, কোনোটা থেকে কেরসিন, কোনোটা থেকে কোনো লুব্রিকেটিং তেল এই রকম আর কি। এত রকম সামগ্রী পাওয়া যায় আর তাদের উপকারিতা এত রকম যে লিখে শেষ করা যায় না।



জর্মন বিজ্ঞানী রন্টগেন তাঁর ল্যাবরেটরিতে এক্স-রে নিয়ে পরীক্ষা করছেন।

লোহা আর ইস্পাত

সিন্ধবাদ নাবিক একবার সমুদ্রে পথ হারিয়ে ফেললেন। পালতোলা জাহাজ ভাসতে ভাসতে একটা পাহাড়ের কাছে এল। সেই পাহাড়টা ছিল চুম্বকের পাহাড়। এখন, তোমরা জান যে চুম্বক লোহা টানে। জাহাজটি যেই সেই পাহাড়ের কাছে এসে পড়েছে আর অমনি জাহাজে লোহা আর ইস্পাতের যা কিছু ছিল, যেমন কাঁটা, পেরেক, কব্জা, শেকল, অস্ত্রশস্ত্র সব কিছু কে যেন জাহাজ থেকে এক ঝাপটায় টেনে নিল। জাহাজখানি টুকরো টুকরো হয়ে গেল আর টুকরো টুকরো কাঠগুলি সমুদ্রে ভাসতে লাগল, কেউ সেই ভাসা কাঠ ধরে প্রাণ বাঁচাল, কেউ জলে ডুবে মারা গেল।

আজ যদি একটা বিরাট চুম্বকের গ্রহ আমাদের পৃথিবীর কাছে হঠাৎ এসে হাজির হয় তাহলে আমাদের পৃথিবীর অবস্থা সিন্ধবাদের সেই জাহাজখানির মতো হবে, আমাদের জীবন অচল হয়ে পড়বে ।

আমরা যত রকম ধাতু ব্যবহার করি তাদের মধ্যে লোহা আমাদের সবচেয়ে বেশি উপকার করে।

আমাদের দেশে নতুন নতুন লোহা আর ইস্পাতের কারখানা বসছে, সেজন্যে লোহা আর ইস্পাত সম্বন্ধে কিছু জেনে রাখা ভাল। আগে তিনটি কারখানা ছিল, বাংলা দেশে আসানসোলের কাছে হীরাপুরে ; জামসেদপুরে টাটার কারখানা আর মহীশূরে ভদ্রাবতীতে। এই তিনটির মধ্যে প্রথম দুটি কারখানা বড় করা হয়েছে। নতুন তিনটি বড় কারখানা হয়েছে

মধ্যপ্রদেশে ভিলাইয়ে, উড়িষ্যায় রাউড়কেলায় আর পশ্চিম বাংলায় দুর্গাপুরে। বিহারে বোকারোতে আর একটি কারখানা বসবে।

মানুষ তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার বছর হল লোহার ব্যবহার শিখেছে। ভারতবাসীরা অনেক দিন থেকে লোহার ব্যবহার জানে। দিল্লীতে কুতুব মিনারের কাছে একটি লৌহ স্তম্ভ আছে। সেটি প্রায় দু হাজার বছরের পুরণো, ওজন ৬ টনেরও বেশি। সেকালে এত বড় একটি থাম কি করে ঢালাই করা হল, সে এক আশ্চর্যের ব্যাপার আর তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার যে থামটিতে একটুও মর্চে পড়ে নি।

আমরা কয়লাকে যে রকমটি দেখি, মাটি থেকে ঠিক সেই রকমটি উঠে আসে কিন্তু লোহাকে আমরা যেমন দেখি, লোহা ঠিক তেমন অবস্থায় পাওয়া যায় না। কারখানায় লোহা-পাথর এনে তাই থেকে লোহা বার করে নিতে হয়। লোহাপাথরের বিজ্ঞানীর নাম হল হিমাটাইট। আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে লোহাপাথর পাওয়া যায়, এত বেশি যে কয়েক শত বৎসরেও তা শেষ হবে না। উড়িষ্যায় কয়েকটি পাহাড় পুরোপুরি লোহা-পাথরেরই তৈরি। অনেক জায়গায় মাটির ওপরেই লোহাপাথর পাওয়া যায়, মাটি খুঁড়তেও হয় না।

লোহাপাথরকে গালিয়ে লোহা বার করা হয়। সেটা কি করে করা হয়, মোটামুটি একটু জেনে রাখ।

লোহা, কয়লা আর চুনাপাথর, এরা যেন তিন বন্ধু। যেখানে এই তিনটি আর জল, কাছাকাছি পাওয়া যায়, সেখানেই লোহার কারখানা বসানো হয়। লোহাপাথরকে গালাতে হলে আগুন জ্বালাবার জন্যে চাই প্রচুর কয়লা আর পাথর থেকে

লোহাকে গালাবার জন্যে চাই চুণাপাথর। চুণাপাথর লোহাপাথর থেকে সব দূষিত জিনিস বার করে দেয় আর সহজে গালিয়েও দিতে পারে।

লোহার কারখানা আর বলব না, ইস্পাতের কারখানাই বলব। কারণ নতুন যে সব কারখানা তৈরি হচ্ছে সেগুলিকে স্টিল প্ল্যাণ্ট বলা হচ্ছে।

ইস্পাতের কারখানার বড় কর্তা হল ব্লাস্ট ফার্নেস। কারখানা অনুযায়ী ব্লাস্ট ফার্নেস ছোট বড় হয়। সাধারণত একটা ব্লাস্ট ফার্নেস ৯০ ফুট উঁচু হয় আর চওড়া হয় ২০ ফুট। ব্লাস্ট ফার্নেস কখনও নেভে না, চব্বিশ ঘণ্টা আগুন জ্বলে এর পেটে। এর ক্ষিধে প্রচণ্ড। প্রতিদিন এর আহার লাগে: ৮০০ টন লোহাপাথর, ৪০০ টন কোক কয়লা আর ১০০ টন চুণাপাথর আর বাতাস। কাঁচা কয়লা দেওয়া হয় না, কয়লাকে আগে কোক ওভেন নামে আর একটা চুল্লীতে পুড়িয়ে কোক করে নেওয়া হয়। কয়লাকে পুড়িয়ে কোক করবার সময় যে সব গ্যাস, আলকাতরা আর অন্য সব সামগ্রী পাওয়া যায় তা থেকে কত ভাল ভাল ওষুধ এবং আরও কত কি পাওয়া যায়। আলকাতরাকে দেখতে অমন কালো হলে কি হয় তা থেকে কত উপকারী ওষুধ, রং এবং অনেক কিছু পাওয়া যায় যার দাম লক্ষ লক্ষ টাকা।

লোহাপাথর, কোক কয়লা আর চুণাপাথর ব্লাস্ট ফার্নেসের মধ্যে ঢালা হয় তার মাথা দিয়ে। ব্লাস্ট ফার্নেসের মধ্যে প্রচণ্ড আগুন জ্বলছে, ভীষণ গরম। সেই গরমে লোহা জলের মতো তরল হয়ে যায়। বিরাট হাতা দিয়ে পাঁচ সাত ঘণ্টা অন্তর অন্তর সেই তরল লোহা তুলে নেওয়া হয়। লোহা যখন গলে যায় তখন

লোহা পাথরের সঙ্গে যে সব ময়লা মিশে থাকে সেগুলি আলাদা বেরিয়ে আসে, তার নাম শ্ল্যাগ।

সেই তরল লোহাকে জমানো হয়। এই লোহার নাম ঢালা লোহা বা পিগ আয়রণ।

লোহা হল মোটামুটি চার রকম, (১) পিগ আয়রণ বা ঢালা লোহা, (২) রট আয়রণ বা পেটা লোহা, (৩) ইস্পাত আর (৪) সংকর ইস্পাত বা অ্যালয় স্টিল।

ঢালা লোহা কম তাপে গলে, সহজে ভাঙে। এ থেকে রেলিং, বৃষ্টির জল বেরুবার পাইপ, এইসব তৈরি হয়।

ঢালা লোহাকে শোধন করে পেটা লোহা তৈরি হয়। পেটা লোহা বেশ মজবুত, সহজে ভাঙে না। পেটা লোহা থেকে শেকল, বল্টু, তার ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

পর্তুগীজ কথা 'এসপাদা' বাংলায় হয়েছে ইস্পাত যেমন ইংরেজি কথা গ্লাস থেকে হয়েছে গেলাস।

কেরসিন তেলের লম্ফ জ্বললে দেওয়ালে ভুষো পড়ে। এই ভুষোকে বলে কার্বন। সব লোহা বা ইস্পাতে কার্বন থাকে। পেটা লোহা আর ঢালা লোহাতে যত কার্বন থাকে, ইস্পাতে থাকে এদের দুয়ের মাঝামাঝি। ঢালা লোহা থেকে বাড়তি কার্বন দূর করে বা পেটা লোহার সঙ্গে আরও কার্বন মিশিয়ে ইস্পাত তৈরি হয়।

ইস্পাত তৈরি করবার চার রকম পদ্ধতি আছে। সেই চার রকম পদ্ধতির নাম হল (১) বেসেমার, (২) ওপন হার্থ, (৩) ক্রুসিবল এবং (৪) ইলেকট্রিক।

গলিত ঢালা লোহার মধ্যে হাওয়া চালিয়ে বাড়তি কার্বন পুড়িয়ে ফেলা হয়, যতটুকু দরকার ততটুকু কার্বন রাখা হয়।

আগে আমাদের দেশে এই ভাবে ইস্পাত তৈরি হত। বেসেমার সাহেব যখন মাদ্রাজে ছিলেন তখন তিনি এটি শিখে নেন। তার পর ইংলণ্ডে ফিরে নিজের নামে চালান। দেশী মিস্ত্রিরা যেটা দেশী উপায়ে করত, বেসেমার সাহেব তাকে বিলিতী করেন, তবে উপায়টা এক। বেসেমার পদ্ধতিতে ৩।৪ ঘণ্টায় ইস্পাত তৈরি হয়ে যায় কিন্তু ওপন হার্থ পদ্ধতিতে ১২ ঘণ্টা সময় লাগে কিন্তু ইস্পাতটা ভাল হয়।

গ্রাফাইটের বড় বড় বাটিতে পেটা লোহা গালিয়ে তাতে কাবন যোগ করে ইস্পাত তৈরি হয়। ঐ বাটির নাম ক্রুসিবল, তাই থেকেই ক্রুসিবল স্টিল নাম হয়েছে।

ইলেকট্রিক চুল্লীতে ইস্পাত তৈরি করার সুবিধে এই যে ইচ্ছে মতো তাপ কম বেশি করা যায়। শেষের দু রকম উপায়ে যে ইস্পাত তৈরি হয় তা থেকে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, স্প্রিং এই সব তৈরি হয়।

লোহার সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়ম, নিকেল, টাংস্টেন প্রভৃতি ধাতু মিশিয়ে সংকর ইস্পাত বা অ্যালয় স্টিল তৈরি হয়। এই সব ইস্পাত খুব মজবুত হয়। লোহার সঙ্গে একত্রে ক্রোমিয়ম আর নিকেল মিশিয়ে স্টেনলেস স্টিল তৈরি হয়। এই ইস্পাতে মর্চে পড়ে না। জার্মানরা এক রকম কাঁচের মতো স্বচ্ছ ইস্পাত তৈরি করেছেন।

টাটা কম্পানির কারখানা হবার আগে আমাদের দেশে দেশী পদ্ধতিতে আদিবাসীরা লোহা তৈরি করত। এখনও সিংভূম জেলার এবং উড়িষ্যার অনেক জায়গায় আদিবাসীরা মাটির তৈরি ক্ষুদে চুল্লীতে লোহা বা ইস্পাত তৈরি করে।

দামোদরে কেন বাঁধ দেওয়া হল?

দামোদর পশ্চিম বাংলার একটি নদী, এমন কিছু বড় নদী নয়। হাজারীবাগ জেলায় নদীটির উৎপত্তি, বর্ধমান, হুগলি আর হাওড়া জেলার ভেতর দিয়ে এসে একটা মুখ পড়েছে ভাগীরথীতে আর একটা মুখ পড়েছে রূপনারায়ণ নদে। ছোট হলে কি হয় নদীর রাগ খুব ছিল। বর্ধমান, হুগলি আর হাওড়া জেলার এক কালে সে খুব ক্ষতি করেছে বিশেষ করে বর্ধমান জেলার সর্বনাশ করেছে।

একশ' বছর আগে দামোদরের কিন্তু এমন অবস্থা ছিল না, তখন সে লোকের কত উপকার করেছে। তখন বর্ধমান জেলায় প্রচুর ধান হত, ম্যালেরিয়া ছিল না, নদী দিয়ে অনেক নৌকো চলত, রাণীগঞ্জ থেকে কয়লা বয়ে আনত।

সেকালে দামোদরের কোনো বাঁধ ছিল না। নদীর জল বেশি বাড়লে বা বান এলে জলটা নদীর দু' পাড় উপচে সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়ত। বানের জল সরে গেলে দেখা যেত যে জমিতে পলি পড়েছে, সেই পলিমাটিতে চাষ বেশ ভাল হত! যে সব ছোট নদী ছিল সেগুলিতে বানের জল যেয়ে পড়ত। সেই নদীগুলিও লোকের কত উপকার করত।

যে বছর বান আসত না সে বছর নদীর ধারের লোকেরা নদী থেকে সরু খাল কেটে জমিতে জল নিয়ে আসত।

নদীর সর্বনাশ হল যেদিন কলকাতা থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেল লাইন পাতা হল। সেই রেল লাইনকে বাঁচাবার জন্যে নদীর দু' ধারে বেশ উঁচু করে বাঁধ দেওয়া হল। কিছুদিন পরে

আবার নদীর ডান পারের বাঁধ তুলে দেওয়া হল। বানটা সেই দিকেই বেশি হতে লাগল। আর যে বার বাঁধ ভেঙে বান আসত সেবার হত কি ভাঙা বাঁধের ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে জল এক দিকেই ছুটে আসত। সে জল চারদিকে ছড়াতে পারত না, সামনে যা কিছু পড়ত সবই ভাসিয়ে নিয়ে যেত। বানের জল বেশির ভাগটা ফিরে যাবার রাস্তা পেত না, কারণ বাঁধ রয়েছে। এখানে সেখানে জল জমে জলা জায়গা আর বিলের সৃষ্টি করত। সেই সব জলা জায়গা আর বিল ম্যালেরিয়ার মশার আড্ডা হল। ছোটখাটো নদীগুলো জল না পেয়ে সেগুলোও হেজেমজে গেল, কতকগুলি নদী আর বিল মশার আড্ডা হল।

তার ওপর আর এক বিপদ দেখা দিল। নদী যেখান থেকে উঠছে সেখানে ঘন বন ছিল। ঘন বন থাকায় সেই বন মাটির মধ্যে অনেক জল ধরে রাখত আর গাছের শেকড় মাটি আটকে রাখত। সেই বন কেটে কেটে পাতলা হয়ে গেছে। সেখানে বৃষ্টি হলে মাটি বেশি জল ধরে রাখতে পারে না। তার ওপর গাছ কমে গেছে অতএব শেকড়ও নেই অতএব মাটিও আলগা হয়ে গেছে। সেই আলগা মাটি বৃষ্টির সঙ্গে ধুয়ে এসে নদীতে পড়তে লাগল। নদীর খাত উঁচু হতে লাগল। নদীর খাত উঁচু হওয়ায় নদী তার খাত বদলাবার চেষ্টা করতে লাগল।

চেষ্টা করলও। ১৯৪৩ সালে দামোদরের ভীষণ বান হল। বর্ধমানের কাছে রেল লাইন ভেঙে ওখান দিয়ে প্রায় দু মাস রেল চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। শুধু যে রেল লাইল ভাঙল তা নয়। দামোদর ঐ খাল দিয়ে ঘুরে সোজা এসে কালনার কাছে গঙ্গায় পড়ল। দামোদরের জল যদি এসে গঙ্গায় ঐখানে পড়তে থাকে তাহলে তার ফল খুব খারাপ হবে। বর্ষাকালে গঙ্গায় অনেক

জল, তার ওপর আবার দামোদরের জল পড়লে জল ভীষণ বাড়বে তখন গঙ্গার দু' পাড় ভাঙতে আরম্ভ করবে এমন কি সেই জলের চাপে কলকাতা শহর আর বন্দর নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কলকাতা শহর আর বন্দর নষ্ট হলে বাংলা দেশের আর কি থাকল ?

দামোদরকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিলে আরও কি সর্বনাশ করবে কে জানে ? অতএব তার পাগলামী বন্ধ করা দরকার। বন্ধ করবার জন্যেই দামোদরের বুকের ওপর দিয়ে বাঁধ দেবার ব্যবস্থা করা হল।

দামোদরের বুকের ওপর কয়েকটি বড় বড় বাঁধ দেওয়া হয়েছে। সেই সব বাঁধের মধ্যে বর্ষার বাড়তি জল ধরে রাখা হয়। এখন অনেক খাল কাটা হয়েছে, সেই বাড়তি জল চাষের সুবিধের জন্যে খাল দিয়ে ছাড়া হচ্ছে। নদীর বান বন্ধ হয়েছে।

এ ছাড়া নদীটিকে আয়ত্বে এনে তার কাছ থেকে আরও অনেক রকম কাজ আদায় করে নেওয়া হচ্ছে।



বিখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী এডিসন, শত শত জিনিস আবিষ্কার করেছেন

গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া

যখন ছোট ছিলুম তখন ঠাকুমা দিদিমার মুখ থেকে অনেক ছড়া শুনেছি ; তার মধ্যে একটা ছড়ার একটা লাইন বোধ হয় এখনও মনে আছে ; সে লাইনটি হল "আম কাঁঠালের বাগান দেবো ছায়ায় ছায়ায় যেতে।" ছড়াটা তখন শুনতে বেশ ভালই লাগত, নয় কি ? মনে মনে আম কাঁঠাল খাবার ইচ্ছেও হত হয়ত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আম কাঁঠালের একটাও গাছ পুঁতিনি বা সে গাছের যত্ন করিনি। বড় জোর যে ল্যাংড়া আমটা খেতে ভাল লেগেছিল তার আঁটিটা কোথাও পুঁতে দিয়েছি, আঁটি থেকে হয়ত একদিন গাছও বেরিয়েছে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই ; তারপর গাছের আর যত্ন নিইনি। অথচ যে কোনো গাছই আমাদের উপকার করে, এমন কি যে গাছে বিষাক্ত ফল হয়, যে ফল খেলে মানুষ মরে যায় তা থেকেও এমন ওষুধ তৈরি হয় যা মানুষের প্রাণ বাঁচায়।

আমাদের দেশে এখন যত বন আছে আগে তার চেয়ে বন অনেক বেশি ছিল। তারপর মানুষ হয়ত মনে করতে লাগল যে বনের ত শেষ নেই উল্টে বনে বাঘ ভাল্লুক থাকে, অতএব বন কাটো। বন কাটতে কাটতে এত বেশি বন কাটা হল যে অনেক দেশ মরুভূমি হয়ে গেল।

বন ছাড়া নদীর ধারে, পুকুর পাড়ে, রাস্তার ধারে, চাষের জমিতে মাঝে মাঝে গাছ থাকলে কি সুবিধা হয় জানো ? প্রথমে বৃষ্টিটা যখন পড়ে তার বেগটা সামলায় গাছের পাতা। তারপর বৃষ্টির জলটা মাটিতে পড়ার পরও গাছের শেকড়,

মাটিতে পড়ে থাকা ডালপাতা আর গাছতলার ছোট ছোট গাছগুলি স্পঞ্জের মতো মাটির মধ্যে জল ধরে রাখে, মাটি বেশ সরস থাকে।

বনে ত পশুপাখি থাকেই আর অন্য জায়গায় যেখানে গাছ থাকে সেখানেও পশুপাখি আসে। গাছে পাখি বাসা বাঁধে, গাছের ছায়ায় গরু, ছাগল আশ্রয় নেয়। তারা গাছের বীজ অন্য জায়গায় নিয়ে যায়, তাদের বিষ্ঠাও জমির সারের কাজ করে। গাছতলায় মাটির মধ্যে কেঁচো আর অন্য অন্য পোকামাকড় বাসা বাঁধে। তারা মাটির মধ্যে চলাচল করে মাটিকে ঝুরঝুরে রাখতে সাহায্য করে।

গাছ না থাকলে বৃষ্টির ধারা জোরে মাটির ওপরে পড়ে, তাতে হয় কি জান? ওপরে যে সারবান মাটি থাকে তা আস্তে আস্তে আলগা হয়ে যায়, আলগা মাটি বৃষ্টির জলের সঙ্গে ধুয়ে বেরিয়ে যায়। যখন বৃষ্টি হয় না, মাটি শুখিয়ে যায়, তখন সেই শুকনো মাটি হাওয়ায় উড়ে যায়। এইভাবে অনেক ভাল ভাল জমি নষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে চাষ হয় না এমন কি ঘাসও জন্মায় না। নদীর ধারে এই অবস্থা হলে নদীর পাড় ভেঙে যায়, পাড়ের মাটি নদীর খাতে জমে খাত উঁচু হয়, আর নদী এদিকে ওদিকে বেঁকে যাবার চেষ্টা। এতেও কত ভাল ভাল জমি নষ্ট হয়। পুকুর পাড়ে কি রাস্তার ধারে গাছ না থাকলে পুকুরের পাড় আর রাস্তা ধসে যায়।

অনেক বন যেমন নষ্ট হয়েছে তেমনি অনেক জমিও নষ্ট হয়েছে; সেই জন্যে আমাদের দেশে প্রতি বৎসর বন মহোৎসব পালন করবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই সময় ভারতের সর্বত্র গাছ পোঁতা হয়।

রোগজয়ের কাহিনী

অসুখ বিসুখ কার না হয় বল? সেবার ত জগন্নাথবাবুর ছেলে বিশ্বনাথ বেচারী অ্যানুয়েল একজামিন দিতেই পারল না। তার নাকি পান বসন্ত হয়েছিল। আর ওদিকে গোপালের দাদা আমাদের ক্লাবের এ টিমের সেণ্টার ফরোয়ার্ড নেপালদা' ফাইনালে খেলবে, সব ঠিক, এমন সময় বেচারীর কলেরা হল। অতি কষ্টে তার প্রাণ বাঁচল। সুনীলের বোন মীরা প্রায়ই সর্দিতে ভোগে। এই রকম কারও দাঁত ব্যথা, কারও পেটের অসুখ।

পৃথিবীতে কত রোগই না আছে, কলেরা, প্লেগ, টাইফয়েড, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, আমাশয়, সর্দিকাশি কত রকম, সব নাম লিখলে এই বইখানাই ভর্তি হয়ে যাবে।

এই যে এত রকমের রোগ আছে তার প্রায় সব রকম রোগ হয় খুব ছোট ছোট জীবাণুর জন্যে। সে সব জীবাণু এতই ছোট যে খালি চোখে তাদের দেখাই যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয়। রোগের জীবাণুগুলি হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়, ধূলোতেও তারা আছে তাছাড়া মানুষ, মশা, মাছি, ইঁদুর, উকুন এবং আরও সব পোকামাকড়, জল, ময়লা তাদের বয়ে বেড়ায়। যেমন মনে কর মশা কামড়ালে ম্যালেরিয়া হয়। কি করে হয়? যে জীবাণুটির জন্যে ম্যালেরিয়া হয়, সেই জীবাণুটি মশার পেটে বাসা বেঁধে থাকে। সেই মশা যখন মানুষকে কামড়ায় তখন ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুটি সে মানুষের রক্তে ছেড়ে দেয়। জীবাণুটি মানুষের শরীরে ঢুকে মানুষটিকে

ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়ে ছাড়ে। আবার একটা নতুন মশা, মনে করা যাক তার পেটে ম্যালেরিয়ার জীবাণু নেই, সে যদি ঐ ম্যালেরিয়া জ্বরের রোগীটিকে কামড়ায় তাহলে তার পেটের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু ঢুকে পড়বে। সে আবার আর একজন মানুষকে কামড়ে তার শরীরে ম্যালেরিয়া ঢুকিয়ে দেবে।

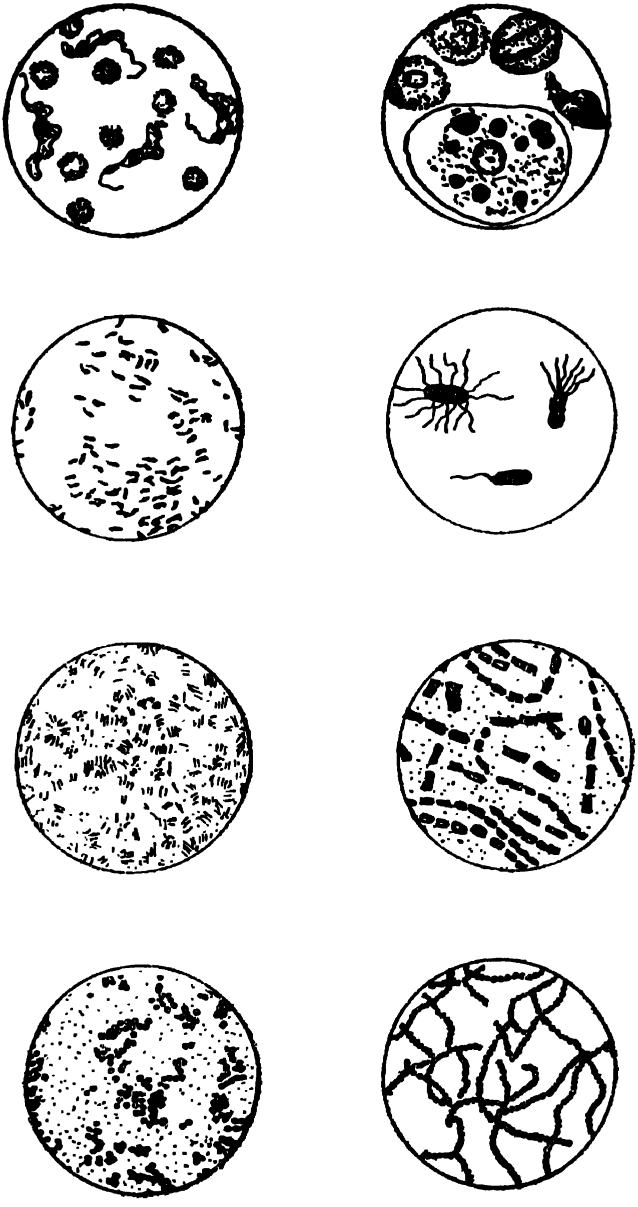
॥ কত রকম জীবাণু আছে ॥

জীবাণু ত আছে বহু রকম। যত রকম রোগ তত রকম জীবাণু। আরও কত রকম আছে, তাদের জন্যে আমাদের রোগ হয় না।

মোটামুটি জীবাণুদের তিন দলে ভাগ করা যাক। এক নম্বর দল হল ভাইরাস, দু' নম্বর দল হল ব্যাকটিরিয়া আর তিন নম্বর দল হল প্রোটোজোয়া। নামগুলো সব খটমটে মনে হবে কিন্তু তিন চার বার পড়লেই ঠিক মনে থাকবে।

ভাইরাসরা এত ছোট যে তাদের ভাল মাইক্রোস্কোপেও দেখা যায় না। তবে আজকাল ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ নামে এক রকম খুব জোরালো মাইক্রোস্কোপ তৈরি হয়েছে তাতে ভাইরাসদের দেখা যাচ্ছে। হাম, পান বসন্ত, সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, এই সব রোগ ভাইরাসদের জন্যে হয়। সর্দি আর ইনফ্লুয়েঞ্জা ছাড়া ভাইরাসদের জন্যে যে সব রোগ হয় সেগুলি একবার হয়ে গেলে আর হয় না।

ব্যাকটিরিয়াদের অবশ্য ভাল মাইক্রোস্কোপে দেখা যায়। আমাদের মুখে, নাকে, গলায়, পেটে অনেক রকম ব্যাকটিরিয়া বাস করছে। কেউ কেউ আমাদের উপকারও করে তবে



নানা রকম রোগের জীবাণু, এদের জন্তেই আমাদের অসুখ-বিসুখ হয়

বেশির ভাগই আমাদের ক্ষতি করে। সামান্য একটা ছুঁচ ফুটলে তার সঙ্গে অনেক ব্যাকটিরিয়া শরীরে ঢুকে যায়, সময় সময় এ জন্যে মানুষ মরে যেতে পর্যন্ত পারে।

ব্যাকটিরিয়া আছে আবার তিন রকম, গোল, লম্বা আর স্ক্রু-এর মতো প্যাঁচানো। যারা গোল তাদের বলে কক্‌সাই বা কক্কাই, লম্বাদের নাম ব্যাসিলাস আর প্যাঁচালোদের নাম স্পাইরিলা।

বাকি রইল প্রোটোজোয়া, এরা একটি সেল্ সর্বস্ব জীবাণু। এদের জন্যে ম্যালেরিয়া, আমাশয় আর ঘুম রোগ হয়।

॥ জীবাণুরা ধরা পড়ল ॥

আমাদের চোখের আড়ালে যে জীবাণু নামে হাজার হাজার রকম অতিশয় ছোট এক বিশাল জগৎ আছে, মোটামুটি আড়াই শ' বছর আগে এ খবর আমাদের জানা ছিল না। হল্যাণ্ডের লিউরেনহুক নামে একজন চশমা ব্যবসায়ী মাইক্রোস্কোপ তৈরি করে তার নীচে এক ফোঁটা জল রেখে তাতে প্রথম তিনি জীবাণু দেখেন। তিনি নানা জায়গার নানা রকম জল নিয়ে নানা রকম জীবাণু দেখেছিলেন।

লিউরেনহুকের আগে জ্যানসেন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেছিলেন কিন্তু অজ্ঞাত জীবাণু জগতের সন্ধান লিউরেনহুকই দিয়েছিলেন। ইংলণ্ডের রাণী, রাশিয়ার জার, এই রকম সব সম্মানিত ব্যক্তিরা তাঁর বাড়ি এসে তাঁর মাইক্রোস্কোপে জীবাণুদের দেখে যেতেন।

॥ জীবাণুদের জন্যেই রোগ হয় ॥

জীবাণুদের জন্যেই যে আমাদের রোগ হয় এই তথ্য আবিষ্কার করে ফ্রান্সের লুই পাস্তুর অমর হয়ে আছেন। আজ যদি এমন পাঁচ জন লোকের নাম করতে হয় যারা মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করেছে তাহলে তার মধ্যে লুই পাস্তুরের নাম নিশ্চয় থাকবে। পৃথিবীতে যত লোক যুদ্ধে মরেছে তার চেয়ে অনেক বেশি লোক বেঁচেছে পাস্তুরের আবিষ্কারের জন্যে।

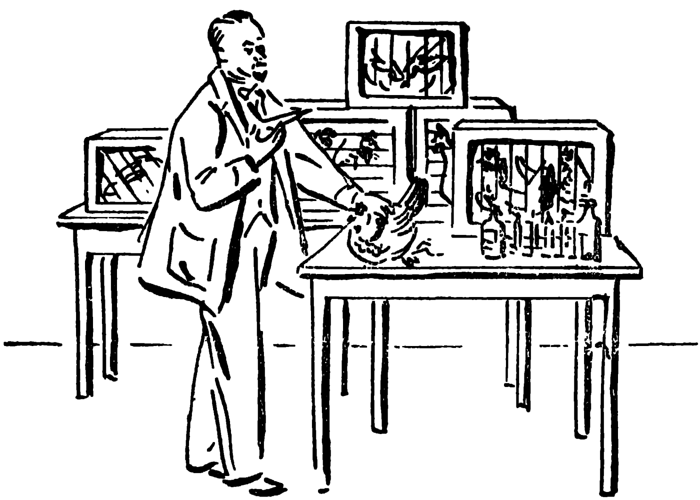
পড়াশোনায় ভাল বলে স্কুলে পাস্তুরের নাম ছিল না। ছেলেবেলায় পাস্তুর ছবি আঁকতে পারতেন তাই অনেকে মনে করেছিল যে তিনি হয়ত শিল্পী হবেন, কিন্তু তিনি হলেন কেমিস্ট বা রাসায়নিক। ভালো রাসায়নিক বলে ছাব্বিশ বছর বয়সেই পাস্তুর কিছু নাম করেছিলেন।

ফ্রান্সে খুব ভাল মদ তৈরি হয় আর সেই মদ দেশ বিদেশে চালান যায়, এতে ফ্রান্সের অনেক টাকা আয় হয়। একবার হল কি কোনো একটি কারখানার সব মদ টকে যেতে লাগল। এই বিপদ এক কারখানা থেকে আর এক কারখানায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বিপদ খুব বেশি, লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হতে লাগল। তখন একজন বুদ্ধি করে পাস্তুরের সাহায্য চাইল। পাস্তুর অনেকদিন ধরে পরীক্ষা করে দেখলেন যে এক রকম খুব ছোট ছোট জীবাণুর জন্যে মদ টকে যায়। পাস্তুর উপায় বাৎলে দিলেন যে সমস্ত মদ কিছুক্ষণ ধরে একটা নির্দিষ্ট উত্তাপে গরম করে নিলে সব জীবাণু মরে যাবে, মদ টকে যাবে না। পাস্তুরের কথা মতো কাজ করায় মদ টকে যাওয়া বন্ধ হল।

তারপর দেখা গেল যে দুধও কিছুক্ষণ গরম করে নিলে দুধের

জীবাণুরা মরে যায়। সে দুধ খেলে ছেলেপুলের কোনো অসুখ হয় না। একে বলা হয় 'পাস্তুরাইজ' করা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার হরিণঘাটায় দুধ বোতলে ভরবার আগে পাস্তুরাইজ করে দেন।

ফ্রান্সে খুব ভাল সিল্ক তৈরি হয়। সেই সিল্ক থেকেও ফ্রান্স অনেক টাকা রোজগার করত। একবার হল কি ফ্রান্সের দক্ষিণ দিকে সিল্কের গুটি পোকাদের এক রকম রোগে ধরল। হাজারে হাজারে গুটিপোকা মরতে লাগল। সিল্ক তৈরি হয় না।



আবার পাস্তুরের সাহায্য চাওয়া হল। পাস্তুর দেখলেন যে জীবাণুর জন্যেই গুটিপোকা মরছে। তখন সেই জীবাণু মারবার ব্যবস্থা করা হল। জীবাণু মরল। গুটিপোকারা বাঁচল, রেশম শিল্পও বাঁচল।

গুটিপোকা থেকে যেমন রেশম হয় আর রেশম থেকে সিল্ক তেমনি ভেড়ার লোম থেকে পশম হয়। সেই পশম বা উল থেকে গরম জামা কাপড় তৈরি হয়। তখনকার দিনে অ্যানথ্রাক্স রোগে দলে দলে ভেড়া মারা যেত। অ্যানথ্রাক্স এক রকম জীবাণু আর

জীবাণুর জন্যেই অ্যানথ্রাক্স রোগ হয়, পাস্তুর এই কথা বললেন। তিনি আরও বললেন যে অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর টিকে দিলে আর ভেড়া মরবে না। পাস্তুরের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।

তখন পাস্তুর একটা পরীক্ষা দেখালেন। তাঁর কথা মতো পঞ্চাশটি ভেড়া নেওয়া হল, তাদের মধ্যে পঁচিশটি ভেড়ার শরীরে অ্যানথ্রাক্সের টিকে দেওয়া হল। টিকে দেওয়া মানে খুব সামান্য অ্যানথ্রাক্স তাদের শরীরে ইনজেকসন দেওয়া হল, এত সামান্য যে তাদের কোনো অসুখ না হতে পারে। কিছুদিন কাটল। তখন সব কটি মানে পঞ্চাশটি ভেড়ার শরীরেই জোরালো অ্যানথ্রাক্স জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া হল। পাস্তুর বললেন যে, যে পঁচিশটা ভেড়াকে টিকে দেওয়া হয়নি সেই পঁচিশটা ভেড়া মারা যাবে। হলও তাই। টিকে দেওয়া পঁচিশটি ভেড়া বেঁচে গেল আর বাকি পঁচিশটি মারা গেল।

কুকুরের এক রকম রোগ হয়। সেই রোগওয়ালা কুকুরকে বলি পাগলা কুকুর। এই পাগলা কুকুর মানুষকে কামড়ালে মানুষের "জলাতঙ্ক" রোগ হয়। জল দেখে তখন মানুষ ভীষণ ভয় পায়। শেষ পর্যন্ত মানুষ মরে যায়।

যোসেফ মাইস্টার নামে ন' বছরের একটি ছেলেকে একটা পাগলা কুকুর কামড়েছে। ছেলেটির মা পাস্তুরের নাম শুনেছিলেন, তিনি তাকে পাস্তুরের কাছে নিয়ে এলেন, যদি পাস্তুর তাকে বাঁচাতে পারেন। পাস্তুর ভাবলেন যে ছেলেটি ত মারা যাবেই তখন একবার শেষ চেষ্টা করেই দেখা যাক যদি বাঁচে। যে পাগলা কুকুরটা ছেলেটিকে কামড়েছিল পাস্তুর সেই কুকুরটাকে ধরে এনে তার গলার ভেতরের লালা থেকে এক রকম ইনজেকসন তৈরি করলেন। সেই ইনজেকসন তিনি

ছেলেটিকে দশ দিনের মধ্যে বারো বার দিলেন। ছেলেটি বেঁচে গেল। এ যেন যাদুমন্ত্র। পাস্তুরের এই সব আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসা করাবার পুরণো সব নিয়ম-কানুন বদলে গেল।

এর আগেই বসন্তের টিকে বেরিয়েছিল তারপর একে একে বেরুতে লাগল সকল রোগের জীবাণু আর তাদের কি উপায়ে দূরে রাখা হয়। অপারেশন করবার আগে ছুরি কাঁচি সব কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে বেশ করে ধুয়ে নেওয়া হতে লাগল যাতে তাদের গায়ে জীবাণু লেগে না থাকে। অপারেশন করবার সময় রোগীকে অজ্ঞান করবার ওষুধ বেরুলো। নতুন নতুন অনেক ওষুধও আবিষ্কৃত হল। যে সব রোগ হলে আগে রোগীকে বাঁচানো যেত না তার ওষুধ বেরুলো। এখনও অনেক রোগ আছে যার কোনো ওষুধ নেই। নিত্য যেমন নতুন নতুন ওষুধ বেরুচ্ছে তেমনি নতুন নতুন রোগও দেখা দিচ্ছে বা পুরণো অনেক রোগও নানা কারণে বেড়ে যাচ্ছে বা ছড়িয়ে পড়ছে।



শেষ কথা

বিজ্ঞানের শেষ কথা বলে কিছু নেই। বিজ্ঞান নিজে বেড়ে চলে সেই সঙ্গে মানুষের জ্ঞানও বাড়ায়।

একটা ছোট্ট বীজ পুঁতলে। সেই বীজ থেকে চারা গাছ হল, চারা গাছ বড় হতে হতে বিরাট এক গাছ হল। সেই গাছের কত পাতা, কত ডাল, কত ফুল, কত ফল হল। প্রত্যেকটি অংশ কত কাজে লাগল। এমন কি সে নিজের ডাল আর পাতার মধ্যে কত পাখীকে আশ্রয় দিল, কত মানুষ রোদ বৃষ্টির সময় তার নীচে দাঁড়াল। সেই সামান্য একটা বীজ থেকে কত কী ঘটল।

বিজ্ঞানও ঠিক সেই রকম। ইটালির একজন অধ্যাপক মরা ব্যাংএ তড়িতের অস্তিত্ব টের পেলেন। তারপর তাঁরই স্বদেশবাসী ভল্টা তামার চাকতি আর দস্তার চাকতি আর মাঝে নুন গোলা জল পর পর সাজিয়ে তাদের একটা তার দিয়ে জুড়ে দিয়ে দেখলেন যে সেই তার দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ বয়ে যায়। এ হল ১৮০০ সালের কথা। তারপর উনিশ বছর পরে কোপেনহ্যাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উরস্টেড ক্লাসে ছেলেদের তড়িৎপ্রবাহ সম্বন্ধে পড়াচ্ছেন। টেবিলের ওপর নানা যন্ত্রপাতি সাজান রয়েছে। কাছেই একটা কম্পাস ছিল। যন্ত্রগুলি সাজাবার সময় উরস্টেড অন্য মনে কম্পাসটা একটা তারের কাছে আনলেন। তারে তড়িৎ ছিল। কিন্তু কম্পাসটা যখন তিনি তারের কাছে এনেছিলেন তখন তার কাঁটা তারের সঙ্গে সমান্তরাল মানে একই লাইনে ছিল। কিন্তু

তারের কাছে কম্পাসটি আসার সঙ্গে সঙ্গেই কম্পাসের কাঁটা উত্তর দক্ষিণ থেকে পূব পশ্চিমে ঘুরে গেল।

তড়িৎপ্রবাহ আর চুম্বকের মধ্যে একটা সম্পর্ক খুঁজে বার করলেন ফ্রান্সের অ্যাম্পিয়ার সাহেব। এ সম্পর্ক খুঁজে বার করতে যেয়ে অ্যাম্পিয়ার যে পরীক্ষা করেছিলেন, সেই পরীক্ষার ফলের ওপর নির্ভর করে সারা পৃথিবীতে টেলিগ্রাফে খবর পাঠান যাচ্ছে।

তারপর এলেন ফ্যারাডে। তিনি এমন সব পরীক্ষা করলেন যার জন্যে ডায়নামো আবিষ্কার হল। ডায়নামো দিয়ে প্রচুর তড়িৎশক্তি তৈরি হতে লাগল। সেই তড়িৎশক্তির সাহায্যে বাড়ি বাড়ি ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে, ট্রেন আর ট্রাম চলছে, স্টিম ইঞ্জিনকে হাটিয়ে দিয়ে বড় বড় কলকারখানা চলছে।

তাহলে উপলক্ষ হল সেই ব্যাং কিন্তু সামান্য তাই থেকে কত কি হল। তাই বলছি বিজ্ঞানের আরম্ভ আছে তার শেষ নেই।